# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০১ খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি

# টপিক



## আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি
টপিক ০২: হযরত আবু বকর (রা.)(৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)
টপিক ০৩: হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)
টপিক ০৪: হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)
টপিক ০৫: হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)
টপিক ০৬: খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ
টপিক ০৭ : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
টপিক ০৮ : সালভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
টপিক ০৯ : অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা
টপিক ১০ : সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১ : বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান

# টপিক ০১: খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



খিলাফত: খিলাফত ইসলামি শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও শাসন কাঠামো। 'খিলাফত' শব্দটি এসেছে 'খলিফা' শব্দ থেকে। খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। আর খিলাফত শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত আর খিলাফত শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। এটি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত অর্থে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানদের পদবিরূপে ব্যবহৃত হয়। খলিফা কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রকে খিলাফত বলা হয়। ইসলামের প্রধান চার খলিফার ইন্তিকালের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে 'খলিফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় 'ইমাম', 'আমিরুল মুমিনিন' শব্দগুলো খলিফা শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে খালদুন বলেন, "খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবি (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।" যে কারণে খলিফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ঐতিহাসিক মাজিদ খাদ্দুরি বলেন, "খিলাফত হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।"

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



খুলাফায়ে রাশেদিন: খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। খলিফা শব্দের বহুবচন খুলাফা। সুতরাং খুলাফা অর্থ প্রতিনিধিগণ এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের অর্থ সত্য ও ন্যায়পথের প্রতিনিধিগণ/অনুগামিগণ। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবি পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন, ইসলামের ইতিহাসে তারাই খুলাফায়ে রাশেদিন হিসেবে পরিচিত। তারা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথ অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজ্যের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। এজন্য খুলাফায়ে রাশেদিনকে বা সত্য ও ন্যায়পথের অনুগামী বলা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদিন হলেন যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আল (রা.)। এই চারজন খলিফার প্রত্যেকে মহানবি (স.)-এর নিত্যসহচর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তারা ৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩০ বছর খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, “এই যুগের চার খলিফা আরব ঐতিহাসিকদের কাছে 'আর রাশেদুন' হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন।"

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন ও হাদিস পাঠে ও খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা হবেন তাকওয়াসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তি। খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার বিষয়ে ইসলাম কড়াকড়ি আরোপ করেনি। জনগণ যেকোনো খোদাভীরু মুসলিমকে কিংবা খলিফার পুত্রকে নির্বাচনের দ্বারা বা মনোনয়নের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত করতে পারে। তারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পরামর্শের ক্ষেত্রে দ্বিমত করেছেন, তবে বিভক্ত হননি। চার খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ-

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উত্তরসূরি কে হবেন? এটি বিরাট জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "The Caliphat, is therefore, the first problem Islam had to face. It is still a living issue." (অর্থাৎ খিলাফত প্রশ্নই ছিল ইসলামের প্রথম সমস্যা (মুসলিম জগতে) এটি আজও জীবন্ত সমস্যা।)

আনসার, মুহাজির সকলে এ সমস্যা সমাধানের জন্য 'ছাকিফা-বানি-সায়িদা' নামক মিলনায়তনে মিলিত হন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৪টি দল তৈরি হয়-

১. মুহাজির: মুহাজিরগণ দাবি করেন যে, তারা সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সুতরাং ইসলামের প্রথম খলিফা হবেন মুহাজিরদের মধ্য থেকে।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

২. আনসার: আনসারগণও দাবি করেন তারা ইসলামের দুর্দিনে হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আনসারদের মধ্য থেকে প্রথম খলিফা হওয়া উচিত।

৩. কুরাইশ: কুরাইশদের দাবি ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। কুরাইশ বংশ অভিজাত বংশ। ফলে প্রথম খলিফা কুরাইশদের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত।

৪. হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থক: হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকগণ দাবি করেন, হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচাতো ভাই এবং একমাত্র জীবিত কন্যা ফাতেমার স্বামী। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে হযরত আলী (রা.)-এর খলিফা হওয়া উচিত।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

বিভিন্ন যুক্তিতর্ক, আলোচনা শেষে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর অথবা আবু উবাইদাকে খলিফা মনোনীত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) বয়স, পদমর্যাদা ও সম্মান বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হওয়ার ঘোষণা দেন এবং তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম বশির ইবনে সাদ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর আবু উবাইদা, উসমান, আব্দুর রহমানসহ উপস্থিত সকলে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এভাবে মুসলিম জাতি খলিফা নির্বাচনের সংকট থেকে মুক্তি পায়।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

হযরত উমর (রা.)-এর নির্বাচন

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন আল্লাহর একজন অলী। তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে ইসলামের ঐক্য, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ করেন। হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত তালহা প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে মনোনীত করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মনোনয়নের সূত্র ধরে হযরত উমর (রা.) মুসলিম জাহানের খলিফা হন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

হযরত উসমান (রা.)-এর নির্বাচন মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নির্বাচনের জন্য হযরত উমর (রা.) ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি দল গঠন করেন। ছয় সদস্য হলেন-

১. হযরত উসমান (রা.),
২. হযরত আলী (রা.),
৩. হযরত তালহা,
৪. আব্দুর রহমান বিন আওফ,
৫. জুবায়ের ও
৬. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস

হযরত উমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে খলিফা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পরিষদকে নির্দেশ দেন। ২৪ হিজরির পহেলা মহরম হযরত উমর (রা.) শাহাদাত বরণ করলে ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য বৈঠকে বসেন। তাঁদের ছয় জনের সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কয়েকদিন আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একে অপরের ভোটের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন করা হবে।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

১. হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.), জুবায়ের ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সমর্থন পান।
২. হযরত তালহা মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না।
৩. আব্দুর রহমান খলিফা হওয়া থেকে নাম প্রত্যাহার করেন।
৪. হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও জুবায়ের (রা.)-এর সমর্থন পান।

এভাবে দেখা যায়, হযরত উসমান (রা.)-কে হযরত আলী (রা.), জুবায়ের ও সাদ মোট ৩ (তিন) জন সমর্থন করেন। অন্যদিকে, হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.) ও জুবায়ের সমর্থন করেন। ফলে হযরত উসমান (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে আব্দুর রহমান বিন আওফ প্রথম বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপর একে একে সবাই হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত উসমান (রা.)।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

হযরত আলী (রা.)-এর নির্বাচন

৬৫৬ সালের ১৭ জুন হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের ফলে খিলাফতের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়। বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরবর্তী খলিফা নির্বাচন বিলম্বিত হয়। ইবনে সাবার নেতৃত্বে মিশরবাসীরা হযরত আলী (রা.)-কে, কুফাবাসীরা হযরত জুবাইরকে ও কুফাবাসীর একাংশ হযরত আলীকে এবং বসরাবাসীরা হযরত তালহাকে খলিফা হিসেবে সমর্থন করেন। বিদ্রোহীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ইবনে সাবার নেতৃত্বে গঠিত মিশরীয়রা শক্তিশালী ছিল। তারা হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা হওয়ার জন্য জোর চাপ দিলে বসরা ও কুফাবাসীরাও সমর্থন করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ৬৫৬ সালের ২৩ জুন হযরত আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। জনগণ একে একে সকলেই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি



## নির্বাচন পদ্ধতি

খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি মূল্যায়ন

চার খলিফার নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দুটি নির্বাচন পদ্ধতির কথা জানা যায়। একটি হলো জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হওয়া এবং অপরটি হলো নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন দান। হযরত আবু বকর (রা.) জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাকওয়াসম্পন্ন শিক্ষিত, ন্যায়বান, আদর্শবান, কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে খলিফাগণ মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতেন। সেই নির্বাচকমণ্ডলী খলিফার মৃত্যুর পর পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করতেন। আল্লাহওয়ালা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী একজন আল্লাহওয়ালা লোককে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। সকলে সদ্য নির্বাচিত খলিফার হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। চার খলিফাই ছিলেন আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি, পরহেজগার, সৎ এবং যোগ্য পদের প্রতি লোভহীন।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০২ হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



সাহাবিগণ তাকওয়া অর্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী। যথাসম্ভব মহানবি (স.)-এর কাছে থাকা, তাঁকে দেখা, তাঁর কথা ও কর্ম হৃদয়ে ধারণ করা ও তাঁর অনুসরণ করাই ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্বপ্ন, সাধনা, কর্ম ও বাসনা। মহানবি (স.)-এর দেওয়া শিক্ষাই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। যেমন- হযরত ওসামাকে সেনাপতি করা। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে সেনাপতি মনোনীত করেছেন বলে তিনি নিজে কোনো বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেননি। তাঁর তাকওয়া সংবলিত ভাষণই আমাদের কুরআন ও হাদিস আঁকড়ে ধরতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.) এর পরিচয়

নাম ও বংশ পরিচয়: হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা-মাতার দেওয়া নাম ছিল আব্দুল্লাহ, উপনাম তথা ডাকনাম আবু বকর, উপাধি ছিল আতিক ও সিদ্দিক। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতার নাম আফফান, প্রকৃত নাম উসমান, উপনাম আবু কুহাফা এবং তার মাতার নাম সালমা ও মাতার পারিবারিক নাম উম্মুল খায়ের।

হযরত আবু বকর (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্ব হতেই তিনি আবু বকর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্বশুর এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাবা। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তম স্বভাবের ছিলেন। আল্লাহ নম্রতা ও কোমলতাকে পছন্দ করেন। লজ্জা, নম্রতা ও কোমলতা ছিল তার চরিত্রের ভূষণ।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.) এর পরিচয়

ইসলামের সেবা: শৈশবকাল থেকে রাসুল (স.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দুর্বার আকর্ষণ ছিল। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (স.) যখন নবুয়ত লাভ করেন তখন তিনি ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ইয়েমেনে ছিলেন। তিনি মক্কায় আসার পর রাসুল (স.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসুল (স.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ - করেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর অর্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এছাড়া বদর, উহুদ, খন্দক ও হুনায়ুনের যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় ইত্যাদিতে উপস্থিত থেকে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

মদিনার মসজিদ গৃহ ও মহানবির বাসগৃহ নির্মাণ এবং তাবুক অভিযানের সময় তিনি একাই ব্যয়ের বৃহত্তর অংশ বহন করেছিলেন। বেলাল (রা.) সহ যে সকল গোলাম ইসলাম কবুল করে মনিবদের নির্যাতন ভোগ করছিলেন, আবু বকর (রা.) তাঁদের অনেককে ক্রয় করে আজাদ দান করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁরই প্রভাবের ফলে হযরত উসমান (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের (রা.) মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## খিলাফত লাভ

মহানবি (স.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও চরম উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। রাসুল (স.) ও নবপ্রতিষ্ঠিত - রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোনো উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে যাননি। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে এক ভয়াবহ ও সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন প্রশ্ন হয় রাসুল (স.)-এর উত্তরাধিকারী হয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনতন্ত্র ও মুসলিম জাতিকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা কে করবে? তখন আরবদের মধ্যে গোত্রীয় নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক ছিল না। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। এজন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাসুল (স.) কাউকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যাননি। আবার তাঁর কোনো পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না। কাজেই এটি ইসলামের জন্য একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে নিয়ে 'ছাকিফা-বানি-সায়িদা'য় উপস্থিত হন এবং সেখানে উপস্থিত জনসাধারণকে লক্ষ করে বলেন যে, ইসলামের ঘোর দুর্দিনে মুহাজেরিন ও আনসারদের স্বার্থ ত্যাগ ও সাহায্য প্রশংসনীয় তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরাইশ বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও নেতৃত্ব আরবের লোকেরা মেনে নিবে না।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## খিলাফত লাভ

এতে আনসারগণ উভয় পক্ষ হতে অর্থাৎ পক্ষ চতুষ্টয়ের মধ্যে শক্তিশালী আনসার ও মুহাজেরিনদের মধ্য হতে একজন করে দু'জনকে খলিফা নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়। হযরত উমর (রা.)-এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন যে, "এক খাপে দুটি তরবারি স্থান পেতে পারে না।" তখন অনৈক্য ও অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) খাযরাজ গোত্রের দলপতি সাদ বিন আবু ওবায়দাকে অথবা হযরত উমর (রা.)-কে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়োজ্যেষ্ঠতা, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বিবেচনায় এনে হযরত উমর (রা.) প্রথা অনুযায়ী তাঁর হাতে চুমু খেয়ে আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকল সাহাবি এবং দলপতিগণ তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন। এভাবে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খিলাফত লাভ করেন এবং মুসলিমদের প্রথম খলিফা হন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## খিলাফত লাভ

উদ্বোধনী ভাষণ: খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বকর (রা.) সমবেত মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় একথাটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, "আমার ওপর শাসনের গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমি আপনাদের চেয়ে যোগ্য নই, আপনাদের সব রকম পরামর্শ ও সাহায্য আমার দরকার। আমি ভালো কাজ করলে আমাকে সমর্থন করবেন; যদি ভুল করি তাহলে পরামর্শ দেবেন। শাসনক্ষমতা নিযুক্ত ব্যক্তিকে সত্য বলাই প্রকৃত আনুগত্য, আর তা গোপন করা বিশ্বাসঘাতকতা। আমার দৃষ্টিতে সবল ও দুর্বল একই এবং আমি উভয়ের প্রতিই সুবিচার করার আশা রাখি। আমি আল্লাহ ও তাঁর নবিকে মান্য করলে আপনারা আমাকে মেনে নেবেন; আর যদি আল্লাহ ও তাঁর নবির নীতি অমান্য করি, তাহলে আপনাদের আনুগত্য লাভের অধিকার আমার থাকবে না।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## প্রাথমিক সমস্যাসমূহ

আরববাসীরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন না। তারা গোত্রীয় প্রধান শেখকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের সচ্ছলতার জন্য যাকাত প্রদান ব্যবস্থার সাথেও তারা পরিচিত ছিলেন না। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের ফলে মদিনার দূরবর্তী আরবেরা দিশেহারা হয়ে বিভ্রান্ত হন। এসবের কারণে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-

১ . বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা: খিলাফত লাভের পর আবু বকরকে (রা.) অনেক সমস্যা ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। হযরতের (স.) মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র আরবে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যে সমস্ত গোত্র সবেমাত্র পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিল তারা পুনরায় পাপের দিকে ধাবিত হলো এবং সে সমস্ত প্রবঞ্চক মহানবির (স.) জীবদ্দশায় দূরবর্তী প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন তারাও মুসলমানদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম মদিনা নগরীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আরব উপদ্বীপের প্রতিমা উপাসক যাযাবর সম্প্রদায়সমূহের বিরুদ্ধে এ একটি নগরকে পুনরায় যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হতে হলো। এ প্রসঙ্গে জনৈক আরব ঐতিহাসিক বলেন, "বিশ্বাসিগণ রাখালহীন মেষপালের মতো বিচরণ করছিল, তাঁদের নবি নেই, তারা সংখ্যায় অল্প এবং তাদের দুশমনের দল সংখ্যাতীত।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## প্রাথমিক সমস্যাসমূহ

২. মদিনার রক্ষা ব্যবস্থা: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অসুস্থতা ও ওফাতের সংবাদ সারা আরবে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এতে শিশু মদিনা রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি একত্র হতে থাকে। বিশেষ করে আবস ও জুবিয়ান গোত্র এবং বেদুইনরা মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আবু বকর (রা.) মদিনা রক্ষা করাকে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

রিদ্দার যুদ্ধ ৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

রিদ্দা আরবি শব্দ। এর অর্থ স্বধর্ম ত্যাগ বা দলত্যাগ। মহানবি (স.)-এর ওফাতের পর হেজাজ প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব দেশ নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় নবুয়তের সম্মান ও পদমর্যাদার লোভে কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অনেকে ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ ও ভণ্ড নবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "বিশ্বজয়ের পূর্বেই আরববাসীকে সর্বপ্রথম আরব দেশকেই জয় করতে হয়েছিল।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

রিদ্দার যুদ্ধের কারণ

রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার নানাবিধ কারণ তথা নিয়ামক পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. ইসলাম প্রচারের সীমাবদ্ধতা: মহানবি (স) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সময়ের স্বল্পতা, প্রতিকূল যোগাযোগব্যবস্থা এবং দীর্ঘসময় যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে আরবের সব অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আসল কারণ হলো যোগাযোগের অভাব ও কম সময়ের জন্য সংগঠিতভাবে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হয়নি।" এছাড়া ওই সময় অনেক গোত্র প্রকৃত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথেই স্বার্থহানি ভেবে তারা ইসলাম ত্যাগ করে এবং অমুসলিমদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

২. ইসলামের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থতা: আরবের অনেক গোত্র রাসুল (স)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বার্থরক্ষার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। খাঁটি বিশ্বাস ও ইসলামের প্রতি প্রকৃত আগ্রহের অভাবে তারা ইসলামের প্রকৃত মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। আলোড়ন জাগানো ফরাসি বিপ্লবের মতো সপ্তম শতকে ইসলাম আরবের বুকে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এলেও আরববাসী এ নতুন জীবনধারাকে সহজে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তারা রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়।

## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

৩. ইসলামি অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ: ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ ও নৈতিক অনুশাসন, সুশৃঙ্খল জীবনাপনের নির্দেশনা মরুবাসী দুরন্ত আরবদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মূলত শৃঙ্খলহীন, উদ্যম ও স্বাধীনচেতা আরবদের অনেকে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় তার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে তারা আর ইসলামের কঠোর অনুশাসন মানতে পারছিল না। ইসলামি অনুশাসন ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করায় তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৪. মদিনার প্রাধান্য অস্বীকার: মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে আরবে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে ওঠে। কিন্তু আরবরা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই অনেকেই এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি। এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মদিনা শহরের প্রভাব বৃদ্ধি অন্যান্য অঞ্চলের আরবদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে। পি. কে. হিট্টির মতে, "হেজাজ রাজধানীর প্রাধান্যও তাদের ঈর্ষা এবং বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

৫. নবুয়তের প্রতি লোভ: ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবি (স)-এর অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরবের অনেকে নবুয়তকে একটি লাভজনক ব্যবসা মনে করে স্বার্থান্বেষী কিছু লোক নিজেদের নবি বলে দাবি করে। নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার বা ভণ্ডনবির মধ্যে ছিলেন ইয়েমেনের আনসি গোত্রের আসওয়াদ আনসি, মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা কাজ্জাব, উত্তর আরবের বনু আসাদ গোত্রের তোলায়হা এবং মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের নারী সাজাহ। এদের মধ্যে সাজাহ ও মুসায়লামা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। স্বার্থপর ভণ্ডনবিরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্রোহী বেদুইনদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। যেসব মুসলমানের অন্তরে তখনও ইসলাম সুদৃঢ় হয়নি তারা ভণ্ডনবিদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় এবং মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

৬. যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি: মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পরে সম্পদশালীরা বিশেষ করে বেদুইন সম্প্রদায় ইসলামের বিধি মোতাবেক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আর্থিক ক্ষতি মনে করে যাকাতকে অস্বীকার করে। স্বাধীনচেতা আরবদের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দেওয়াকে নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। বিভিন্ন বেদুইনগোত্র যাকাতের বিরুদ্ধে ভণ্ডনবি তোলায়হার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

ভণ্ডনবিদের পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষদিকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ড বা নকল নবির আবির্ভাব ঘটে। নবুয়ত প্রাপ্তিকে তারা লাভজনক মনে করে নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। মহানবি (সা.) মৃত্যুর সংবাদে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইসলামের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়। ভণ্ডনবিদের পরিচয় নিম্নরূপ-

১ . আসাদ আনসি: ভণ্ডনবিদের মধ্যে ইয়েমেনের আসাদ আনসিই ছিল প্রথম। মহানবি (সা.)-এর জীবিতকালে দশম হিজরিতে (৬৩১-৩২ খ্রি.) নবুয়ত দাবি করে এবং ইয়েমেন হতে মুসলিম প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করে সমগ্র ইয়েমেন ও নজরান দখল করে। সে পার্শ্ববর্তী গোত্রপ্রধানদের সহযোগিতায় এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু মহানবি (সা.)-এর ওফাতের একদিন অথবা দুদিন পূর্বে তার আত্মীয় ফিরোজ দায়লামি কর্তৃক সে নিহত হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মদিনায় পৌঁছে। *কিন্তু মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ ইয়েমেনে প্রচারিত হলে তার ভক্তগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ওয়ে ওঠে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

২. মুসায়লামা: ভণ্ডনবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল মুসায়লামা। মধ্য আরবের ইয়ামামায় বানু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা নিজেকে নবি বলে দাবি করে। সে প্রতিনিধি আগমনবর্ষে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তন করেই নিজেকে নবি বলে দাবি করে। মুহাম্মদ (সা.) তাকে নিবৃত্ত করার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসায়লামা মহানবি (সা.)-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব পদ্ধতির নামাজ প্রচলন করে।

৩. তোলায়হা: উত্তর আরবের বনি-আসাদ গোত্রের তোলায়হা নামক এক ব্যক্তিও নিজেকে নবি বলে দাবি করে। সে মদিনায় বেদুইন সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে যাকাতবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ইসলামি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৪. সাজাহ: মধ্য আরবের ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নাম্নী এক নাসারা নারীও নিজেকে নিজেকে নবি বলে দাবি করল। সে খ্রিষ্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হলো। সে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে বিবাহ করে। এভাবে নকল নবিদের ও মুনাফেক ধর্ম প্রচারকগণের বিদ্রোহের ফলে মক্কা ও মদিনা ব্যতীত আরবদেশে এক চরম সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা: জুলকাসা ও রাবাজা নামক স্থানে খলিফার নেতৃত্বে আবস ও জুবিয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়। হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.) প্রমুখকে মদিনা নগরীর বিভিন্ন প্রবেশপথে প্রহরী রেখে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নেতৃত্বে জুলকাসা (ধুলকাসা-Dhulqassah) নামক স্থানে শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ করেন। এর ফলে শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হযরত ওসামা (রা.) সিরিয়া থেকে ফিরে এলে তার দলের ওপর মদিনা রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুদের অনেকেই বন্দি ও নিহত হয়। বনি আবস ও জুবিয়ান গোত্রের কেউ কেউ বুঝাখায় ভণ্ডনবি তোলায়হার সাথে মিলিত হয়।

শত্রুদের পরাজয়ের ফলে মদিনা নগরী রক্ষা পায়। এভাবে প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে এবং মদিনার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে সাহস সঞ্চার হয়। তাসিম ও তায়ী গোত্র হতে প্রতিনিধি এসে মদিনায় রাজস্ব জমা দেয়। শত্রুদের পশুচারণ ক্ষেত্র মুসলমানদের দখলে আসে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

বুঝাখার যুদ্ধ: উত্তর আরবের বনি আসাদ গোত্রের দলপতি তুলায়হা ছিল নজদের অধিপতি। সে নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করে এবং জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এছাড়া মদিনার বেদুইনদের সাথে মিলিত হয়ে যাকাত বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অপচেষ্টা চালায়। ৬৩২ সালের শেষের দিকে মুসলিম বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে বুঝাখার নামক স্থানে তোলায়হার সাথে মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনীর তেজস্বিতা, যুদ্ধকৌশল ও প্রবল আক্রমণে তোলায়হা নিজের জীবন নিয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। এভাবে তো লায়হা ও তার সমর্থক দল মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ বুঝাখায় এক মাস অবস্থান করে সকল শত্রুদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তার সমর্থকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবু বকর (রা.) আসাদ গোত্রকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এর ফলে আসাদ গোত্র মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং মুসলমান হয়। পরবর্তীতে তোলায়হা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেক যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে বীরত্ব প্রদর্শন করে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সাজাহ ও মালিক বিন নুবিয়াকে দমন: সাজাহর পূর্বপুরুষগণ 'ইয়ারবু' গোত্র থেকে উদ্ভূত। সাজাহ ও তার পরিবারের লোকজন মেসোপটেমিয়া গিয়ে তাঘলিব গোত্রের সঙ্গে বসবাস শুরু করে। নবুয়তকে লাভজনক ব্যবসায় মনে করে সে নিজেকে 'নবি' বলে দাবি করে এবং তাঘলিব গোত্রের সমর্থন আদায় করে। ইয়ারবু উপগোত্র ও তার দলপতি মালিক বিন নুবিয়া তাকে সমর্থন করে। তাদের পরিকল্পনা ছিল মদিনাকে আক্রমণ করা। খালিদ ইয়ারবু উপগোত্রকে আক্রমণ করে মালিক বিন নুবিয়ারসহ বেশ কিছুসংখ্যক লোককে বন্দি করে এবং আহত থাকার কারণে মালিক বিন নুবিয়ায় নিহত হয়। সাজাহ পালিয়ে মুসায়লামাকে বিয়ে করে। ইয়ারবু গোত্র খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে মুসলিমদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইসলাম একটি বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসায়লামা ও সাজাহ-এর বিরুদ্ধে অভিযান: ভণ্ডনবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মুসায়লামা। মধ্য আরবের ইয়ামামা নামক স্থানে তার জন্ম। সে ছিল হানিফা গোত্রের দলপতি। মুসায়লামা স্বলিখিত বাণীকে অহিপ্রাপ্ত বাণী বলে প্রচার করে এবং নিজেকে নবি বলে দাবি করে। এসব বিবিধ কারণে মুসায়লামা ও সাজাহ-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। ভণ্ডনবি দাবিদার মুসায়লামার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০। তার সমর্থক গোত্র ছিল বনি হানিফা, সাজাহর বাহিনী ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি গোত্র।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

বাহরাইনের বিদ্রোহ দমন: বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন মুনজির। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের কিছুদিন পর তিনি মারা যান। তার মৃত্যুতে বাহরাইন প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বনি বকর গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু ধর্মভীরু বনি আবুল কায়েস গোত্র তাদের বিরোধিতা করে। ফলে তাদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়। প্রথম গোত্র পারস্যের এবং দ্বিতীয় বা মুসলিম গোত্র মুসলিমদের সাহায্য কামনা করে। বনি বকর ও পারস্যের সম্মিলিত বাহিনী খলিফা কর্তৃক মুসলিম বাহিনী ও বনি আবুল কায়েস-এর সম্মিলিত বাহিনীর নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এভাবে বাহরাইনের বিদ্রোহ দমন হয়। তারা মদিনায় রাজস্ব পাঠাতে সম্মত হয়। বাহরাইনের মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ওমানের বিদ্রোহ দমন: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাত, মদিনায় রাজস্ব পাঠানো, চারদিকে ইসলাম বিরোধী মনোভাব ইত্যাদি কারণে ওমানেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাহরাইন থেকে কিছু সৈন্য ওমানে আসে এবং হোজায়ফা ও ইকরামার মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। ওমানের শাসনকর্তার সহযোগিতায় মুসলিম বাহিনী ওমানের বিদ্রোহ দমন করেন। ইকরামা আরবের পূর্বাঞ্চল হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে 'মাহরা' দখল করেন। এভাবে ওমানের বিদ্রোহ দমন হয় এবং হোজায়ফা ওমানের শাসক নির্বাচিত হন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

হাজরামাউতের বিদ্রোহ দমন কিনদা গোত্রের নেতারা হাজরামাউত অঞ্চল শাসন করত। কিনদা নেতা আল আশাথ-বিন-কায়েস হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবিতকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ওফাতের পর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বিশৃঙ্খলা শুরু করে। এজন্য এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হয়। মুসলিম বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়। প্রথম দলের সেনাপতি ইকরামা হাজরামাউতের পূর্বাঞ্চল দখল করেন এবং মুহাজিরের সেনাপতিত্বে হাজরামাউতের পশ্চিমাঞ্চল দখল হয়। এরপর তারা একত্রিত হয়ে কিনদা নেতা ও তার বাহিনীর মুখোমুখি হন। আল আশার পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং এক দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুজাহিদ বাহিনী তাকে বন্দি করে মদিনায় প্রেরণ করেন। খলিফা তাকে ক্ষমা করে দেন। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং পারস্য ও ইরাকে অভিযানরত মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। হাজরামাউতে বিদ্রোহ দমনের সাথে এক বিরাট অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ হাজরামাউতের বিদ্রোহ দমনের পর গোটা আরবে আর কোথাও বিদ্রোহ দেখা দেয়নি।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

যাকাত প্রদানে বাধ্যকরণ: বিভিন্ন কারণে আরবের যেসব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কিংবা যাকাত প্রদানে বিরত ছিল, তাদেরকে ইসলামের অনুশাসন বোঝানো এবং যাকাত প্রদানে রাজি করার জন্য খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), তালহা (রা.) ও যুবাইরকে প্রেরণ করেন। আলোচনা ব্যর্থ হলে একদিন সকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাকাত বিরোধী শক্তি পরাজয়বরণ করে। তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং ইসলামের বিধিবিধান মোতাবেক তারা যাকাত প্রদানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

রিদ্দা যুদ্ধের ফলাফল

৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী গোত্রের ও বিভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত বাহিনীকে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও নির্দেশনায় বীর সেনাপতিদের সহায়তায় দমন করেন। এর ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলিমদের ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়, আরব জাতীয়তাবাদের অখণ্ডতা রক্ষা পায়। রিদ্দা যুদ্ধের ফলে একদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা নিরসন হয়, অন্যদিকে রোমান ও পারসিকদের সতর্ক বার্তা জানানো হয়। সর্বোপরি, এতে ইসলামের জয় হয়। এ যুদ্ধের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধ: রিদ্দা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল হুমকি থেকে রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "রিদ্দা যুদ্ধের পরাজয় যেমন মারাত্মক হতো তেমনি এর জয় ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।" এ যুদ্ধে জয়লাভ করে ইসলাম শুধু আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই পায়নি বরং আরবের বুকে ইসলামের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত হলে ইসলাম মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

## রিদ্দার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

২. মদিনা রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ: রিদ্দা যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মদিনার মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙনের হাত থেকে এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "রিদ্দার যুদ্ধ ছিল আরবদের ওপর রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের যুদ্ধ।" এই যুদ্ধে বিজয়ের পর যাকাত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে খিলাফতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে এবং সমাজে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। সমাজ থেকে গোত্রপ্রীতি ও রক্তপাত বন্ধ হয়। আরব উপদ্বীপ ইসলামের সাম্যবাদী ও আল্লাহর একত্ববাদের নীতিকে মেনে নেয়।

৩. মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি: রিদ্দা যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এ জয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশ্বজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। রিদ্দার যুদ্ধে বিজয়ের যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়, এর ফলেই পরবর্তী সময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিমরা আরবের বাইরে আক্রমণ করার সাহস পায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টি. ডব্লিউ. আরনল্ড বলেন, "রিদ্দার যুদ্ধে জয়ের পর ইসলাম যে শক্তিলাভ করেছিল এরই প্রেক্ষিতে মুসলমানরা বিখ্যাত রোমান-বাইজান্টাইন ও পারসিকদের পরাজিত করার সাহস পায় এবং এসব অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

পারস্যের বর্তমান নাম ইরান। পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদায়েন। খলিফা আবু বকর (রা.) ৬৩৩ সালে (১৩ হিজরিতে) পারস্যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। তখন পারস্যের সম্রাট ছিলেন হরমুজ। জর্দান, সিরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইন নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক ইউরোপ মহাদেশের ইতালি ও এর রাজধানী রোমকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে।

সিরিয়া ছিল রোমানদের অধীনে একটি প্রদেশ। রোমানদের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল এবং সিরিয়ার রাজধানী ছিল দামেস্ক। দ্বিতীয় খসরুর সময় (৫৯০-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) রোমানরা পারসিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে। কয়েক বছর পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া পুনরায় দখল করে নিজ শাসনাধীনে আনেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

পারসিক ও রোমান সাম্রাজের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ

মুসলিম বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান, সীমান্ত সংঘর্ষ, মুসলিম দূতকে হত্যাসহ নানা কারণে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রিদ্দার যুদ্ধে উস্কানি: মহানবি (সা)-এর সময় থেকে পারসিক ও রোমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। মহানবি (সা.) ইন্তেকালের পর পারসিকরা ও রোমানরা মুসলিম তথা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনে তৎপর হলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পারসিক ও রোমীয়দের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে পারস্য সম্রাট হরমুজ বিভিন্ন মুসলিম গোত্রকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতে সাহায্য ও উস্কানি প্রদান করতে থাকেন। বাহরাইনের বিদ্রোহ দমনকালে পারস্যবাসীরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। ফলে মুসলিম বাহিনী পারস্যবাসীদের শত্রু হয়ে পড়ে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

২. মুসলিম দূত অপমান: হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম কবুল করার দাওয়াতপত্র ইরানের (পারস্যের) রাজা ২য় খসরু পারভেজের নিকট দূত মারফত প্রেরণ করেন। পারভেজ পত্র ছিন্নভিন্ন করে দূতকে অপমানিত করেন। এছাড়া অবজ্ঞাভরে এক ঝুড়ি মাটি দূতকে উপহার দেন। হযরত আবু বকর (রা.) সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইসলামের নিরাপত্তার জন্য পারস্য সীমান্তে বিদ্রোহের সম্ভাবনা রোধ করার মানসে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

২. মুসলিম দূত অপমান: হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম কবুল করার দাওয়াতপত্র ইরানের (পারস্যের) রাজা ২য় খসরু পারভেজের নিকট দূত মারফত প্রেরণ করেন। পারভেজ পত্র ছিন্নভিন্ন করে দূতকে অপমানিত করেন। এছাড়া অবজ্ঞাভরে এক ঝুড়ি মাটি দূতকে উপহার দেন। হযরত আবু বকর (রা.) সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইসলামের নিরাপত্তার জন্য পারস্য সীমান্তে বিদ্রোহের সম্ভাবনা রোধ করার মানসে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনে অপতৎপরতা: মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর শক্তি এবং মুসলিম রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে রোমান সম্রাট মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনের অপতৎপরতায় লিপ্ত হন। সুযোগ পেলেই তিনি তার নাগরিকদের মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকেন। সিরিয়ায় বসবাসরত আরব বেদুইনরা মাঝে মাঝে আরব সীমান্ত হানা দিতে শুরু করে। আরব মুসলিম বণিকগণ সিরিয়ার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আসলে তাদের উৎপীড়ন করতে থাকে। এ অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শেষ ইচ্ছানুযায়ী খলিফা আবু বকর (রা.) সিরিয়া সীমান্তে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রথমবার নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতে জয়লাভ করেন। সার্বিক নিরাপত্তার কারণে দ্বিতীয়বার তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

পারস্য ও রোমান অভিযান

উবাল্লার হাফির যুদ্ধ: উবাল্লার হাফির নামক জায়গা। মুসলিম সেনাপতি মুসান্নার নেতৃত্বে ৮০০০ (আট হাজার) ও খালিদের নেতৃত্বে ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য উবাল্লার হাফির নামক স্থানে একত্রিত হয়ে পারস্য বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তুমুল যুদ্ধ শেষে পারস্য বাহিনী পিছু হটতে থাকে এবং চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে। হরমুজ নিহত হন। হরমুজ নিহত

হওয়ার সংবাদ পারস্য রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছলে আরেকটি বাহিনী খালিদের গতিরোধ করার চেষ্টা করে কিন্তু তারাও পরাজিত হয়। অবশেষে সেনাপতি বাহমনির নেতৃত্বে পারস্য বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। ওয়ালাজা ও আল্লিমের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

শৃঙ্খলের যুদ্ধ ও মহিলার দুর্গ বিজয়: উবাল্লার হাফির নামক স্থানে পারস্য বাহিনীর সেনাপতি হরমুজ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সৈন্যবাহিনীর পিছনের সারিকে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা মাটির সাথে বেঁধে রাখেন। উদ্দেশ্য ছিল কাপুরুষের ন্যায়, যুদ্ধক্ষেত্র হতে কোনো সৈন্য যেন পালিয়ে যেতে না পারে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন আমৃত্যু যেন সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সেনাপতি হরমুজের এ যুদ্ধ কৌশলের জন্য ইসলামের ইতিহাসে এটি শৃঙ্খলের যুদ্ধ (Battle of Chain) নামে পরিচিত হয়।

মুসলিম বাহিনী প্রধান মুসান্না শত্রুর পশ্চাৎগমন করতে করতে খ্রিষ্টান রাজকুমারী দ্বারা রক্ষিত একটি দুর্গের (The Lady's Castle) সম্মুখবর্তী হন। সেনাপতি মুসান্না দুর্গ অধিকারের ভার তার ভাইকে দিয়ে ওই মহিলার স্বামী কর্তৃক রক্ষিত অন্য আরেকটি দুর্গ দখল করতে অগ্রসর হন। সেনাপতি মুসান্না রাজকুমারীর স্বামীকে পরাজিত করে তার দুর্গ দখল করেন। অন্যদিকে, মুসান্নার ভাই রাজকুমারীর দুর্গ দখল করেন। রাজকুমারী স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করলে মুসান্নার ভাই তাকে বিবাহ করেন। রাজকুমারী দুর্গকে ইসলামের ইতিহাসে 'মহিলার দুর্গ বিজয়' বলা হয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

হীরা ও আনবার দখল: পারস্য অভিযান শেষে বিজয়ী বাহিনী নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ হীরা অবরোধ করেন। হীরা ছিল ইরাকের রাজধানী। মুসলিম সেনাপতি ও হীরাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম কবুল না করলে তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে জিজিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। হীরাবাসী ইসলাম কবুল না করে নির্দিষ্ট হারে জিজিয়া প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ৬০,০০০ দিরহাম দিতে তারা রাজি হয়।

হীরা বিজয় সমাপ্ত হলে খালিদ উত্তর দিকে অভিযান পরিচালনা করে ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর তীরবর্তী আনবার নামক স্থানটি দখল করেন। আনবার হতে কিছু দূরে অবস্থিত আইন-উত-তামরও মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। ৬৩৩ সালে সম্পাদিত হীরার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আরব উপদ্বীপের বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পাদিত মুসলমানদের এটিই সর্বপ্রথম সন্ধি। এখানকার অধিবাসিগণ মুসলিমদের অধীনে বহুদিন খ্রিষ্টধর্ম মতেই ছিলেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

সিরিয়া অভিযানের ঘটনাবলি: ৬৩৩ সালের শরৎকালে সিরিয়া অভিযানের জন্য খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনীকে ৩ (তিনটি) ভাগে ভাগ করেন। আমর-ইবনে-আল আসকে ৩,০০০ সৈন্যের সেনাপতি করা- হন। তিনি আইলাহ হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে রওনা দেন। পরবর্তীতে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৫০০ জনে। ইয়াজিত-ইবন-আবি সুফিয়ান ও শোরাহ বিন-ইবন-হাসানা প্রত্যেকে প্রথমে ৩,০০০ এবং পরবর্তীতে ৭,৫০০ সৈন্য নিয়ে তাবুকের পথে এগিয়ে চললেন। আবু উবাইদা একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। মরু সাগর ও আকাবা সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত উপত্যকায় ফিলিস্তিনের শাসনকর্তা সারগিয়াসের সাথে মুসলিম সেনাপতি ইয়াজিদের বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে সাজ্জার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। পলায়নরত বাহিনীকে দাসিনে ৪ ফেব্রুয়ারি ৬৩৪ সালে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে তার ভাই থিওডোরাসের অধীনে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। থিওডোরাস ৩০ জুলাই ৬৩৪ সালে আজদাইনে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব

প্রতিবারের মতো এবারও মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। ফলে সমগ্র ফিলিস্তিন জয় করা মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম সামরিক বাহিনী যখন একটির পর একটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সিরিয়া বিজয়ের সূত্রপাত করে তখন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন (২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে)। আজদাইনের যুদ্ধে রোমানদের ১,৪০,০০০ (এক লাখ চল্লিশ হাজার) সৈন্য নিহত এবং মুসলিমদের ৩,০০০ (তিন হাজার) সৈন্য শাহাদাত বরণ করে। ইসলামের ইতিহাসে আজদাইনের যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী এবং এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আজদাইনের যুদ্ধেই মুসলমানরা এরূপ বৃহত্তম যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধের বিজয়ের সূত্র ধরেই মুসলিম বাহিনী ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দখল করে। এ যুদ্ধের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এককালের বৃহৎ শক্তি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের একাংশ দখল করা। এছাড়া আজদাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী বহু গনিমতের মাল লাভ করে। গনিমতের কারণে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনীতি চাঙা হয়ে ওঠে।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্র

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন জান্নাতি। আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদত-বন্দেগি কবুল করেছেন। কারণ তাঁর ইমান আকিদা ও কর্ম বিশুদ্ধ ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আকিদা ছিল বিশুদ্ধ এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে আলোকিত। তিনি সেগুলো পুরাপুরি পালন করতেন।

স্বভাব : হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন কোমল ও নম্র প্রকৃতির লোক। বিনয়, সততা ও ভদ্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনগণ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বিব্রতবোধ করতেন। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি নিজেকে যতটুকু জানি, তুমি আমাকে তার চেয়েও বেশি জান। আমার পাপ মাফ করে দাও এবং তাঁদের অত্যধিক প্রশংসার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে বলো না।" তাঁর প্রবৃত্তি, ষড়রিপু পবিত্র কুরআন ও হাদিসের প্রতি অনুগত ছিল।

সততা ও ন্যায়পরায়ণতা: হযরত আবু বকর (রা.)-এর সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল সর্বোচ্চ স্তরে। মহানবি (স.) সততা ও ন্যায়পরায়ণতার যে স্তরে তাঁর উম্মতদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন, হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সেই স্তরের। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। আবার ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্র

ধর্মীয় জীবন: আবু বকর (রা.) হালাল খাদ্য গ্রহণ করতেন। একবার তিনি ক্রীতদাস কর্তৃক প্রদত্ত খাবার খেয়ে জানলেন যে, তা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ছিল। তখন তিনি সাথে সাথে বমি করে দেন। আবু বকর (রা.) আউয়াবীনের নামাজ, এশরাকের নামাজ, সালাতুত তওবা এবং তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করতেন। নামাজরত অবস্থায় তাকে প্রাণহীন মনে হতো। পবিত্র কুরআন শরিফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি যিকর করতেন। মহানবি (স.)-এর মাসনুন দোআ পাঠ করতেন। তিনি আল্লাহ পাকের এত শোকর গুজারি করতেন যে, লোকেরা তাঁকে শোকর গুজার হিসেবে আহ্বান করত।

সারকথা, হযরত আবু বকর (রা.) দুই বছর তিন মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এসময় তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন। রাষ্ট্র পরিচালনাতেও তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতিত্ব

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। ৬১০ সালে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত লাভের বছর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে নিজের জীবন, পরিবার পরিজন, সংসার সবকিছু থেকে ইসলাম অধিক প্রিয় ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে ইসলামের প্রতি তাঁর অনন্য ভূমিকার কারণে তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিহিত করা যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তড়িৎ গতিতে সমস্যা সমাধান করতেন বলেই ইসলাম সংকট থেকে মুক্তি পায়।

গণতন্ত্রমনা : হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের কার্যকলাপ থেকে সহজেই বলা যায়, তিনি গণতন্ত্রের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে শলা-পরামর্শ করে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, "রাজাকে (খলিফাকে) দেশের আইনের অধীনে এবং দেশের আইনকে জনসাধারণের ইচ্ছার অধীন করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দান করে আবু বকর (রা.) প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়াপত্তন করেন।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতিত্ব

চারিত্রিক দৃঢ়তা: হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্রের খলিফা ছিলেন। ইসলামের অনুশাসনের সাথে কোনো আপস চলে না। হযরত উমর (রা.) সহ বেশকিছু নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে আপসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি দৃঢ়তার ও বিনয়ের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর জন্যই ইসলাম বেদুইন ধর্মের সাথে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি অথবা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়নি। এজন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা (Saviour of Islam) বলা হয়। ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন, "Like his master, Abu Bakar (R) was extremely simple in his habits gentle but firm, he devoted all his energies to the administration of new born state and to the good of people." অর্থাৎ "আবু বকর (রা.) তাঁর নেতার ন্যায় সহজ-সরল ছিলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র অথচ দৃঢ়চিত্ত। তিনি তাঁর সর্বশক্তি এক নবীন রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় ও জনকল্যাণে উৎসর্গ করেন।"

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতিত্ব

বিদ্রোহ দমনে কৃতিত্ব: ইসলামের ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে হিজাজ প্রদেশ ছাড়া গোটা আরব দেশ মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমন বিপর্যয়ের সময় কতিপয় ভণ্ড ব্যক্তি নিজেদের নবি বলে দাবি করে। অনেকে মদিনার প্রাধান্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিচ্ছিন্নতাকামীদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আবু বকর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর, ইয়াজিদ, আবু উবাইদাসহ সকল আরব যোদ্ধাদের নিয়ে বিদ্রোহ দমন করে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে ইসলামকে এক অনিবার্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতিত্ব

কুরআন শরিফ সংকলন: ৬৩৩ সালের পূর্বে কুরআনের পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নির্দেশে যায়িদ বিন সাবিত এবং আরও কয়েকজন সাহাবি চামড়া, তালপাতা, ছাগলের কাঁধের হাড়, কাগজের টুকরা ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত ও সূরা লিপিবদ্ধ করে রাখত। ৬৩৩ সালে ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০০ কুরআনে হাফিজ শাহাদাতবরণ করলে কুরআন শরিফ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রধান ওহি লেখক যায়িদ বিন সাবিতের সাহায্যে সর্বপ্রথম কুরআন শরিফের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।

যাকাত বিরোধীদের দমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্পদের মালিকের শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দেওয়া ফরজ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজ আয়ের একটি অংশ প্রদান করতে আরববাসীরা অভ্যস্ত ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর ইয়ামেন, হাজরামাউত, ওমানসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর সাথে মদিনায় পাঠানোতে অনীহা এবং মদিনার প্রাধান্যে ঈর্ষা যোগ হয়। ইসলামের সংকটকালের উদ্ধারকর্তা আবু বকর (রা.) ভাবলেন, আল্লাহর বিধানের সাথে কোনো আপস নেই। ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়ন করা ফরজ। এজন্য তিনি যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

# হযরত আবু বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)



## হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতিত্ব

বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান: হযরত আবু বকর (রা.) শুধু গোটা আরবেই ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেননি, আরবের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদ্বয় পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বৃহদাংশ ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের ফলে গোটা আরবের ভিতরে, সীমান্তে এবং আরবের বাইরে ইসলাম এবং তার অনুসারীদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, চাপা বিদ্রোহ দমন হয় এবং নিরাপত্তাহীনতার হুমকি আসার আগেই নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা হয়। সহজ ভাষায় বলা যায়, পারসিক ও বাইজান্টাইনদের হাতের তরবারি দিয়ে পবিত্র ইসলাম খান খান হওয়ার আগেই ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি ইসলামকে রক্ষা করেন।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৩ হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

# টপিক ০৩: হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল | |
|---|---|---|
| | ক | খ |
| | গ | ঘ |

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) স্বশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কুলজীশাস্ত্র (বংশধারা শাস্ত্র) বক্তৃতা, কুস্তি, অশ্বারোহণ এবং অসি (তরবারি) চালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি সারাজীবন ইসলামের খাদেম ছিলেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসার খাতিরে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, হুনায়ন, খাইবারসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুগে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে সৌভাগ্যের ও গর্বের বিষয় মনে করা হতো। মদিনা সনদ ও হুদাইবিয়ার সন্ধি রচনায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং তাঁর শাসন সোনালি যুগের ১ চনা করে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয়

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হযরত উমর (রা.), ডাক নাম আবু হাফস, উপাধি ফারুক। পিতার নাম- খাত্তাব বিন নুফাইল বিন ওজ্জা, মায়ের নাম- খানতামা। মাতামহের নাম হিশাম ইবনে মুগিরা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা শহরে কুরাইশ বংশের 'আদ্দিয়া' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলিয়া যুগে কুরাইশ বংশের ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি কুস্তিগীর ও বাগ্মিতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাব্যও রচনা করতে পারতেন। উকাজের মেলায় তিনি কুস্তি ও কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। খিলাফতের সময় থেকে তিনি কাব্য রচনা ত্যাগ করেন। যুদ্ধবিদ্যা, বক্তৃতা, বংশতালিকা মুখস্থকরণ ইত্যাদিতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তিনি মস্তবড় পালোয়ান ছিলেন এবং অশ্বারোহণে তাঁর পারদর্শিতা ছিল সর্বজনবিদিত। তবে তিনি পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে সিরিয়া ও পারস্য ভ্রমণ করেছেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয়

ইসলাম গ্রহণ: হযরত উমর (রা.) প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে কুরাইশরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তিনি তাদের ওপর নির্যাতন করতেন। একদা তিনি আবু সুফিয়ানের প্ররোচনায় মুক্ত তরবারি হাতে রাসুল (স.)-কে হত্যা করতে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতির ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংবাদ শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ছুটে যান। কিন্তু ভগ্নি ফাতিমার কন্ঠে পবিত্র কুরআন শরিফের বাণী শুনে তাঁর প্রাণ বিচলিত হয়ে ওঠে। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে রাসুল (স.)-এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এভাবে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩৩ বছর বয়সে হযরত উমর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ রাসুল (স.)-এর ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মাত্র ৪০ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরেই ইসলাম প্রচার ও প্রসার দ্রুতভাবে শুরু হয়। মহানবি (স.) তাঁকে 'ফারুক' (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয়

খিলাফত লাভের পূর্বে ইসলামের খেদমত নবি করিম (স.) স্বল্পসংখ্যক অনুগামী যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তখনো হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে তিনি মদিনা শরিফে হিজরতের সময়ে বিশজন মুসলমানের একটি দলের সঙ্গী ছিলেন এবং আপদে-বিপদে সর্বক্ষণ রাসুলে করিম (স.)-কে সাহায্য করেছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানগণ মদিনায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন তখন হযরত উমর (রা.) অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে তিনি উক্ত সন্ধিচুক্তি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসুলে করিম (স.) তাঁকে আল্লাহর নির্দেশ জ্ঞাপন করে সান্ত্বনা দিলে তিনি তাঁর ইচ্ছায় সম্মতি জানান। খাইবারের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অষ্টম হিজরিতে তিনি মক্কা অভিযানে যোগদান করেন। তাঁবুক অভিযানের সময়ে তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের মোট সঞ্চয়ের অর্ধেক অর্থ রাসুলে করিম (স.)-এর তহবিলে দান করেছিলেন। প্রথম খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তিনিই সর্বপ্রথম আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং তাঁর খিলাফত আমলে তিনি তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয়

হযরত উমর (রা.)-এর নির্বাচন ও খিলাফত লাভ: হযরত আবু বকর (রা.) তালহা (রা.)-কে হযরত উমর (রা.)-এর মনোনয়নের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি (উমর) তাঁর মতে, সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর তিনি উসমান (রা.)-কে ডেকে এনে হযরত উমর (রা.)-এর একটি মনোনয়ন পত্র লিখে নিলেন। মনোনয়ন পত্র সম্পাদনের পর হযরত আবু বকর (রা.) অনেক কষ্টে নিজ গৃহের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাইসব, আমি আমার কোনো আত্মীয়স্বজনকে খলিফা মনোনীত করিনি বরং উমর (রা.)-কে মনোনীত করেছি যাতে আপনারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন। এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মনোনয়ন মেনে নিলাম। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিন যখন ফুরিয়ে আসছিল, তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাবার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা হতে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে খিলাফতের গুরুদায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয়

কারণ কঠোরতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও জাগতিক কর্তব্য সম্বন্ধে হযরত উমর (রা.) সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক্ষেত্রে আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আব্দুর রহমান বললেন, হযরত উমর (রা.)-এর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তাঁর স্বভাব বড় কঠোর। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অন্যান্য আনসার ও মোহাজেরদের মতামত নিলে তারা সকলেই হযরত উমর (রা.)-এর মনোনয়নকে সমর্থন করলেন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর দশ বছরের শাসনামলে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত লাভ ইসলামের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি বিদেশে অবস্থানরত সামরিক অভিযানকে সমর্থন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ও সামরিক নীতি গ্রহণ করেন। খিলাফতের সম্প্রসারণে হযরত উমর (রা.)-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো-

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিজয় আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমে রোমান অধিকৃত এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ও মিশর নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হতো। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস দূতকে সাদরে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে নানা কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

বাইজান্টাইন বিজয়ের ধারাবাহিক ঘটনাবলি: হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত লাভকালে মুসলিম সামরিক বাহিনী আজদাইনে অবস্থান করছিল। সেখানে বিখ্যাত সেনাপতিগণ আমর, ইয়াজিদ, শোরাহবিল, আবু উবাইদা ও খালিদের মোট ৪০,০০০ (চল্লিশ) হাজার সৈন্যের দল ছিল। নিম্নে বিজয়ের ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হলো-

১ . ফিহল নগরী দখল ও দামেস্ক দখল (৬৩৫ খ্রি.): ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি জর্দান নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত ফিহল নগরী দখল হয়। একই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি মারজ উস-সুফফারের যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্য বাহিনী দামেস্কের পূর্ব তোরণে হাজির হয়। আমর-ইবন-উল আস তুমা তোরণে, শোরাহবিল ফারাদিম তোরণে, আবু উবাইদা জারিয়া তোরণে এবং ইয়াজিদ কাইমান তোরণে সৈন্য সন্নিবেশিত করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরোধ থাকার পর ৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে দামেস্ক নগরী আত্মসমর্পণ করে।

২. হিমসের যুদ্ধ (৬৩৫ খ্রি.): দামেস্ক দখলের পর হিমসে সামান্য যুদ্ধের পর হিমস মুসলিমদের অধীনে আসে। তবে এ সময় খলিফা বিজয়াভিযানে স্থগিতাদেশ দিলে সেনাপতি আবু উবায়দা, আমর জর্ডানে ও খালিদ দামেস্কে অবস্থান গ্রহণ করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৩. ইয়ারমুকের যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রি.) খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন উত্তর সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে জয় করতে ব্যস্ত তখন হিরাক্লিয়াস আর্মেনিয়ান, সিরিয়ান, রোমান ও আরব গোত্রীয় খ্রিষ্টানদের নিয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০' (পঞ্চাশ হাজার)। হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরাস ছিল এর প্রধান সেনাপতি। বালাজুরির মতে, তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)। প্রখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ গুপ্তচরের মাধ্যমে বাইজান্টাইনদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল ত্যাগ করে মুসলিম সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। তিনি ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন। মুসলিম বাহিনী জর্ডানের পূর্বদিকের করদ রাজ্য ইয়ারমুককে যুদ্ধের স্থান হিসেবে বেছে নেয়। এটি ছিল আরব সীমানার কাছাকাছি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গাগুলোর অন্যতম। বাইজান্টাইনদের সেনাবিন্যাস ছিল অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। ধর্মযাজকগণ ক্রুশ হাতে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাদের সৈন্যদের প্রাণপণে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দেন। কয়েক মাস খণ্ড যুদ্ধ চলে। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট বাতাসে উড়া ধুলোয় আচ্ছন্ন একটি গরম দিনে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৪. জেরুজালেম অধিকার (৬৩৭ খ্রি.): ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলিম সেনাপতি আমর-বিন-আস প্রথমে ফিলিস্তিন দখল করেন। এরপর ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম অবরোধ করেন। আমরের আগমনে রোমান সেনাপতি আরতাবুল আগেই নগর ছেড়ে পালিয়ে যান। জেরুজালেমের প্রধান সেনাপতি সোফরোনিয়াস (Sophronius) আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হন। তবে তিনি শর্ত জুড়ে দেন যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন। ১৬ হিজরির রজব মাসে হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর ওপর তাঁর অবর্তমানে খিলাফতের ভার দিয়ে জেরুজালেমে রওনা হন। জেরুজালেমে খলিফা খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধিতে তাদের জানমালের নিশ্চয়তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়। খলিফা ছাড়াও সাক্ষীস্বরূপ খালিদ, আমর, মুয়াবিয়া ও আব্দুর রহমান বিন আউফ স্বাক্ষর করেন। খলিফার মধুর ব্যবহারে খ্রিষ্টানরা মুগ্ধ হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৫. উত্তর সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ছিলেন মেসোপটেমিয়ার শাসক। হিরাক্লিয়াস মেসোপটেমিয়ার লোকজনের সহায়তায় আলেকজান্দ্রিয়া হতে এন্টিয়কের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এদিকে বাইজান্টাইন সৈন্যরা এন্টিয়কে এসে হাজির হলে কিননাস্ত্রীন, আলেপ্পো এবং অন্যান্য শহরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফা উমর (রা.)-এর আদেশে সাদ কুফা হতে কা'কার অধীনে একটি সেনাদল সিরিয়ায় পাঠান। আবু উবাইদা, খালিদ ও কা'কার সম্মিলিত আক্রমণে উত্তর সিরিয়ায় মুসলিম আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. জাজিরা দখল (৬৩৮ খ্রি.): রোমান সম্রাটের প্ররোচনায় জাজিরাবাসিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মুসলমানগণ তাদের দেশের নিরাপত্তা বিধান করার পর যুদ্ধ হতে বিরত থাকলেও জাজিরাবাসীর বিদ্রোহের কারণে বাধ্য হয়ে আরও একবার মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করেন। ৩০,০০০ বিদ্রোহী জাজিরাবাসীকে পরাজিত করে আবু ওবায়দা জাজিরা দখল করে খিলাফতের অধীনে আনেন।

৭. আর্মেনিয়া দখল (৬৩৯-৪০ খ্রি.): বাইজান্টাইনগণ বিভিন্নভাবে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখলের চেষ্টা করে। তাদের প্ররোচনায় কুর্দ ও আর্মেনিয়ানরাও আরবদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ কারণে মুসলিম বাহিনী উত্তর মেসোপটেমিয়া ও আর্মেনিয়া দখল করে নেয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

পারস্য বিজয়

আরব সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইরাক হতে আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ইরান নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। আরব ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝখানে সেলমা মরুভূমি বাফার বা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মতো অবস্থিত ছিল। এ মরুভূমির অধিবাসিগণ আরবীয় যাযাবর বংশোদ্ভূত ছিল। আরবের মুসলমানগণ পারস্য সাম্রাজ্য দখল করলে তারা অনায়াসে বিজয়ীদের সাথে হাত মেলায়।

পারস্য বিজয়ের কারণ: হযরত ওমরের শাসনকাল ছিল ইসলামি খিলাফতের সম্প্রসারণের যুগ। এ সময়ে সীমান্ত সমস্যাসহ নানা কারণে পারস্যবাসীদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. ইসলামের প্রতি ঈর্ষা: মুসলমানদের কোনো প্রকার উন্নতি এবং ইসলামের সমৃদ্ধি পারস্যবাসিগণ কোনোভাবেই সহ্য করতে পারত না এবং তারা সর্বপ্রকারে তাঁদের ধ্বংস সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নানা উস্কানি দেয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

২. মুসলিম দূত হত্যা: মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম দূতকে অপমানিত ও সোরাহবিল কর্তৃক হত্যা করায় পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ মুসলমানদের শত্রুতে পরিণত হন। এভাবে আন্তর্জাতিক নীতর অবমাননা করায় এর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ পারস্য বিজয় মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩. বিদ্রোহীদের সাহায্য: রিদ্দা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন পারস্যবাসিগণ বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য প্রদান করেন। পারস্যবাসীদের জঘন্য দুশমনীর জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুসলমানগণ বাধ্য হন। আরববাসীর নিরাপত্তা বিধানের জন্যই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৪. অর্থনৈতিক কারণ ইরাকের ওপর দিয়ে ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীদ্বয় প্রবাহিত হওয়ার ফলে এটা অত্যন্ত উর্বর এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হতো। ইরাকের সাথে আরববাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পারস্যবাসী মুসলমান আরব বণিকদেরকে অব্যাহতভাবে তাদের দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল না। এ অর্থনৈতিক কারণে মুসলমানরা পারস্য বিজয় করে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৫. পারস্যের ভৌগোলিক গুরুত্ব: ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের গুরুত্ব অনেক ছিল এবং আরবের সাথে তার সীমান্ত ছিল। ইরাক সীমান্তে আরববাসীদের সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্যই এ অঞ্চল মুসলমান দেশভুক্ত হওয়া নেহায়েৎ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, "অন্য কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তৎক্ষণাৎ ঘটিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।"১ পারস্যবাসীদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি: হযরত উমর (রা.)-এর পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি নিচে আলোচনা করা হলো-

১ . ব্যাবিলনের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.) প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শৃঙ্খলের যুদ্ধ ও উলিসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ উলিসের যুদ্ধে হীরা দখল করলেও খলিফা আবু বকর (রা.)-এর আদেশে খালিদ হীরা পরিত্যাগ করে সিরিয়ায় এ সময় পারস্য সম্রাট খসরু হরমুজের নেতৃত্বে মুসান্নার বিরুদ্ধে ১০,০০০ পারসিক সৈন্যের এক বাহিনীকে প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় মুসান্না সৈন্যসহ হঠাৎ ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং এটা ব্যাবিলদের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুসান্না খলিফার নিকট সীমান্ত রক্ষার্থে আরও কিছুসংখ্যক সৈন্য চেয়ে পাঠান। ইতোমধ্যে খলিফা আবু বকর (রা.) মারা যান এবং ওমর (রা.) খিলাফত লাভ করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

২. নামারিকের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): পারস্য সম্রাট ব্যাবিলনে পরাজয়ের সংবাদে সুদক্ষ সেনাপতি রুস্তমের অধীনে এক বিরাট বাহিনীকে হীরা দখলের জন্য পাঠান। মুসান্না খলিফা ওমর কর্তৃক সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। অচিরেই আবু ওবায়দা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির হলে নামারক নামক স্থানে পারসিকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পারসিকরা পরাজিত হয় এবং হীরা মুসলমানদের দখলে থাকে।

৩. জসর বা সেতুর যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): ব্যাবিলনের নিকটবর্তী একটি অঞ্চলে ফোরাত নদীর তীর সংলগ্ন ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ নভেম্বর সাকীফ গোত্রের আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর সাথে পারসিক বাহিনীর যুদ্ধ হয়। পারসিকদের অধিনায়ক বাহমানের আক্রমণে মুসলিম বাহিনী হেরে যায় এবং সেনাপতি আবু উবাইদাসহ ৭ জন মুসলিম সেনাপতি শহিদ হয়। সেতু নির্মাণ ও ব্যবহারের কারণে এ যুদ্ধের নামকরণ হয় জসর বা সেতুর যুদ্ধ। ৯,০০০ সৈন্যের মধ্যে এ যুদ্ধে ছয় হাজার মুসলিম সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। সেনাপতি মুসান্না এ যুদ্ধে আহত হন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৪. বুয়ায়েবের যুদ্ধ (৬৩৫ খ্রি.): সেতুর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) আরও অধিক সৈন্য প্রেরণ করেন ও যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করে দেন। হযরত উমর (রা.) হযরত জাবির-এর অধীনে এক বিশাল বাহিনী সেনাপতি মুসান্নার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেন। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মুসান্নার নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীর সাথে বুয়ায়েব প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি মেহরানসহ বহু সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধের ফলে মাদাইন পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মুসলমানদের পতাকাতলে আসে। মুসান্নার ভাইসহ বেশকিছু যোদ্ধা মুসলমানদের পক্ষে প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধের পর সেনাপতি মুসান্না বেশিদিন বেঁচেছিলেন না। কারণ তিনি সেতুর যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

৫. কাদেসিয়ার যুদ্ধ (৬৩৭ খ্রি.): বুয়ায়েব যুদ্ধের পরে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী টেসিফোনে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ক্ষমতায় আসেন ইয়াজদ জারদ। তিনি ছিলেন অল্পবয়সি। তিনি মেসোপটেমিয়ায় নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হীরা পর্যন্ত শহরগুলোতে সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বাধীন ১,২০,০০০ সৈন্যের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ করে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যের একটি বাহিনী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সেনাপতিত্বে প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) যুদ্ধ এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি মদিনা থেকে মুসলিম বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। সৈন্যদের সামরিক প্রস্তুতি, আক্রমণ, কৌশল, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবিন্যাস, কোথায় কোথায় তাঁবু ফেলবেন, যুদ্ধে কেমন জায়গায় অবস্থান নিবেন ইত্যাদি বিষয়ে হযরত উমর (রা.) দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস 'কাদেসিয়া' নামক জায়গা পছন্দ করেন। এর সামনে পারস্যের সমতল ভূমি এবং পিছনে আরবের পর্বতমালা ছিল। অবশেষে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাদেসিয়ার প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং মুসলিমরা বিজয়ী হয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত হানে। এ যুদ্ধের ফলাফল গোটা পারস্য সাম্রাজ্য দখলের সূচনা করে। সেমেটিক ইরাকিগণ আরববাসীদের নিজ গোত্র বলে আনুগত্য লাভ করে। মুসলমানরা প্রচুর গনিমত লাভ করে। প্রথম দুদিনে ২,৫০০ এবং শেষদিনে ৬,০০০ মুসলিম সৈন্য প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধ পারস্য ও ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং এটা সাসানীয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে।

৬. মাদাইন বিজয় (৬৩৭ খ্রি.): মাদাইন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী। এটি বর্তমান বাগদাদ হতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম তীরে সিলিউসিয়া এবং পূর্ব তীরে টেসিফোন অবস্থিত। টেসিফোনে সম্রাট ইয়াজদ জারদ-এর বাসভবন ছিল। কাদেসিয়া যুদ্ধের কয়েক মাস পর খলিফার অনুমতিক্রমে সা'দ মাদাইনের দিকে ধাবিত হন। বিনা প্রতিরোধে ৬৩৭ সালের জুনে এককালের পৃথিবীর বৃহৎশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মুসলমানদের দখলে আসে। প্রচুর ধনসম্পত্তি ও মণিমানিক্য মুসলমানদের অধিকারে আসে। সম্রাট সপরিবারে পালিয়ে হুলওয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

### পারস্য ও বাইজান্টাইন বিজয়ের ফলাফল

মুসলিমদের পারস্য ও বাইজান্টাইন বিজয়ের ফলাফল ও গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে পারস্য, সিরিয়া, মিশর ও ফিলিস্তিনের মতো উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলিমগণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়। এছাড়া বিজিত জাতির সংস্পর্শে এসে মুসলমানরা তাদের সামরিক নৈপুণ্য অনুসরণ করে নিজেদের একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ফলে পরবর্তী বিজয় অভিযান সহজতর হয়। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানরা গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং তাদের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে- যা ইসলামি সভ্যতার জন্মদান করে এবং বিশ্ব সভ্যতায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

পারস্য ও বাইজান্টাইন বিজয়ে মুসলমানদের সফলতার কারণ প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক আরব মুসলমানের বিস্ময়কর সাফল্য মুসলিম ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। মুসলমানদের সাফল্যের কারণ হচ্ছে-

১. জাতীয়তাবাদ: ইসলামের ইমানভিত্তিক জাতীয়তা শতধাবিভক্ত আরববাসীর অন্তরে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে এবং শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জনে সাফল্য বয়ে আনে। জাতির মঙ্গলের জন্য মুসলমানরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়।

২. আরবদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা: পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর মুসলমানদের জয়লাভের মূল কারণ ছিল তাদের ধর্মীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা। 'বাঁচলে গাজি মরলে শহিদ'- এ জিহাদি মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলমানরা জীবনপণ যুদ্ধ করে এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়।.

৩. আরবদের সামরিক নৈপুণ্য ও শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব: আরবদের অসামান্য বীরত্ব, রণনৈপুণ্য, কর্মদক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আমর, খালিদ, মুসান্না ওবায়দা প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের সামরিক নৈপুণ্যের কারণেই মুসলমানরা জয়লাভে সক্ষম হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

### মিশর বিজয়ের কারণ ও ঘটনাবলি

সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। মুসলমানগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন দখল করে মিশর জয়ের জন্য অভিযোন পরিচালনা করেন। এর পিছনে বেশকিছু কারণ ছিল। যেমন- সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের অনেক মুসলিম খ্রিষ্টান মিশরে আশ্রয় নেয়। মিশরীয়দের থেকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন পুনঃদখলের সম্ভাবনা ছিল। এছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার খ্রিষ্টান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক ছিল। হেজাজ প্রদেশের কাছাকাছি মিশর অবস্থিত। এসব কারণে মিশর বিজয় মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মিশরের সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমানদের শক্তিশালী নৌঘাঁটি দুর্গ ও সেনানিবাস ছিল। ফলে সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়ার সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের জন্য নৌঘাঁটি ও নৌবাহিনী একান্ত প্রয়োজন। আরব দেশ অনুর্বর। অন্যদিকে, মিশর নীলনদের দান। নীলনদের উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে মিশর ছিল খুবই উর্বর ও কৃষি সম্পদে ভরপুর। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, শস্য-শ্যামলা নীলনদের দান মিশর জয় করতে পারলে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন মিটবে, এজন্য মিশর দখল করেন। বিভিন্ন সময় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আমর মিশরে গিয়েছিলেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

আল ফারামা ছিল পূর্ব মিশরের স্নায়ুকেন্দ্র। ৬১৬ সালে পারস্য আক্রমণের পর থেকে ফারামার প্রতিরক্ষা শক্তি আর পুনর্গঠিত হয়নি। ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর মাত্র ৪০০০ (চার হাজার) সৈন্য নিয়ে আমর-ইবন-আল-আস মিশর দখলে অগ্রসর হন। ৬৪০ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে তিনি আল ফারামা অবরোধ করেন। প্রায় এক মাস অবরোধের পর আল ফারামা মুসলমানদের দখলে আসে। আমর আল ফারামা দখল করে কায়রোর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিবলস ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান দখল করে ব্যাবিলনের নিকটবর্তী হন। হেলিওপলিসের যুদ্ধের আগে খলিফা উমর (রা.) আমরের মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অধিনায়ক জুবায়ের ইবনুল আওয়াম, ওবাদা ইবনে সামেত, মিকদাদ ইবনে উমর এবং সালমা ইবনে মাখলাদের অধীনে আরও দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইনদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ২০,০০০ (বিশ হাজার) এবং দুর্গে ৫,০০০ সৈন্য মজুদ ছিল। মুসলিম বাহিনী আইন-শামস বা হেলিওপলিস আক্রমণ করে। বাইজান্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। সেনাপতি থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং বাইজান্টাইন শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাধ্য হয়ে সাইরাস মুসলিমদের সাথে আপসের চেষ্টা করেন। ৭মাস অবরোধের পর ৬৪১ সালের ৬ এপ্রিল মুসলিম সেনাপতি জুবায়ের দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ব্যাবিলন দখল করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

### আলেকজান্দ্রিয়া দখল

আলেকজান্দ্রিয়া দখল ছিল মিশর অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কনস্টান্টিনোপলের পর বিশ্বে সুন্দরতম এবং শক্তিশালী শহর ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়া ছিল মিশরের রাজধানী। দুর্ভেদ্য লম্বা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। আমর তার বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী অবরোধ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীর হতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগে বাইজান্টাইনগণ যুদ্ধের প্রথমদিকে আরবদের বিব্রত করে তোলে। আমর একদল সৈন্য অবরোধে রেখে ব্যাবিলনের দিকে যুদ্ধবিগ্রহ করতে থাকেন। মুসলমানদের অধীনে দেশ পরিচালনার জন্য ৬৪১ সালের ৮ নভেম্বর ব্যাবিলনে মুসলিম সেনাপতি আমর-বিন-আল আস-এর সাথে বিশপ এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে বলা হয় আলেকজান্দ্রিয়ার চুক্তি। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকে দুই দিনার করে কর দিতে হতো। চুক্তির সময় সাইরাস আরবদের ১৩,০০০ দিনার প্রদান করেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য জমিজমার ওপরও কর ধার্য হয়। আরও চুক্তি হয় যে, একজন বাইজান্টাইন সৈন্যকেও আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরতে দেওয়া হবে না কিংবা কোনো ভূখণ্ড পুনঃরুদ্ধার করতে দেওয়া হবে না। ৬৪২ সালের সেপ্টেম্বরে এ শহর পুরো খালি হয়ে যায়। অর্থাৎ বাইজান্টাইন সৈন্যরা চলে যায়। সম্রাট কনস্ট্যান্স ছিলেন খুব দুর্বল এবং তরুণ। তিনি এ চুক্তি অনুমোদন করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

ফুসতাত নগর প্রতিষ্ঠা

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর আমর বিন আস ব্যাবিলনের নিকট একটি সুন্দর শহর নির্মাণ করেন (৬৪২ খ্রি.)। এটিই বিখ্যাত ফুসতাত শহর। বর্তমান কায়রো (আল-কাহিরা) শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফুসতাত নগর ছিল মিশরের রাজধানী।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খিলাফতের সম্প্রসারণ

উত্তর আফ্রিকা অভিযান

বহু মিশরীয় রোমানরা উত্তর আফ্রিকার বার্কা ও ত্রিপলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখান থেকে তারা মিশর সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে শুরু করে। ৬৪৩ সালে আমর বার্কায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। বার্কাবাসী বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে এবং কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যদিকে, ত্রিপলির অধিবাসীরা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের সাথে আমর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদের পরাজিত করেন। ফলে বার্কা ও ত্রিপলিতে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের সাম্রাজ্য বিস্তারে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এটি মুসলিমদের সামরিক ঘাঁটি ও নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এতে আব্দুল্লাহ ও হযরত মুয়াবিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নৌঘাঁটি ব্যবহার করে ৬৪৯ সালে মুয়াবিয়া সাইপ্রাস দখল করেন। ৬৪২ সালে ফুসতাত নগরীর গোড়াপত্তন করা হয় এবং সুয়েজ খাল খনন করা হয়। যেটি ব্যবসায় বাণিজ্যসহ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ধারা উন্মোচন করে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খালিদ বিন ওয়ালিদের পরিচয়

খালিদ ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল ওয়ালিদ। এ মহান সেনাপতির উপাধি ছিল সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত তিনি ইসলামের শত্রু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেও অবশেষে তার অসাধারণ রণনৈপুণ্যের জন্য পরাজয় বরণ করেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর তিনি এবং আমর-ইবনে-আল-আস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলামের খেদমতে তিনি তার সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেন। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুতার যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এ যুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্বের জন্য রাসুলুল্লাহ তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা বিজয়ের সময় তার অসীম বীরত্বে কুরাইশগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশে সেখানে তিনি আল ওজ্জার দেবমন্দির ধ্বংস করে ফেলেন। ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিনা রক্তপাতে নজরানের হরিস গোত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## খালিদ বিন ওয়ালিদের পরিচয়

আবু বকরের (রা.)-এর সময়ে ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ যখন আরববাণী ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামের বিপর্যয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন তিনি অসীম বীরত্ব দ্বারা ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ভণ্ডনবি তোলায়হাকে তিনি বুঝাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর তিনি আসওয়াদ ও সাজাহকে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

হযরত উমর (রা.) খলিফা হয়ে তাকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে সুশাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি জীবনের কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হননি। তার অসাধারণ বীরত্বের কাহিনি ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার শেষ জীবন বড় দুঃখময় হয়েছিল। হঠাৎ কতিপয় অভিযোগে খলিফা উমর তাকে প্রধান সেনাপতি এবং শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করেন। শেষ জীবনে কষ্ট ভোগ করে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ইসলামের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। পূর্ব রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য দখলের ফলে সমগ্র ইসলামি সমাজের জন্য একটি সাধারণ শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই রাজ্য বিজয়ের সাথে সাথে তিনি এর সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা: মহানবি (সা.) ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হলেও হযরত উমর (রা.) ছিলেন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠ বিজেতা ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সাধারণতন্ত্রের শাসন প্রণালিকে তিনি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন এবং তাকে তিনি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "ত্রিশ বছরের খিলাফত আমলের শাসনব্যবস্থা উমর (রা.)-এর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাঁরই অনুসৃত নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।" এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "তাঁর শাসনকাল ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ বিজয় সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। তিনি শুধু একজন বিখ্যাত রাজ্যবিজেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরঙ্কুশ সাফল্যের অধিকারী জাতীয় নেতাদের অন্যতম।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসন: হযরত উমর (রা.) ইসলামের আদর্শকে ধারণা ও লালন করেছিলেন। মহানবি (সা.) ও আবুবকর গণতন্ত্রের যে বীজ রোপণ করেন তিনি তা পূর্ণ করেন। পারস্য ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত হওয়ার ফলে কুরআন, হাদিস ও ইজমার ভিত্তিতে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপদান করেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় কুরআন ও হাদিসের অধীনে সকল অধিবাসী শতভাগ স্বাধীন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত পেশ করতে পারত। শুক্রবার মসজিদের খুৎবা অনেকটা জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক ইশতিহারে পরিণত হতো।

সাম্য ও সমধিকার: হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ তথা নরনারীর সমান অধিকার ছিল। তার সময়ে এবং আইনের চোখে সবাই সমান ছিল। তাঁর মতে আইনের চোখে খলিফা ছিলেন জনসাধারণেরই একজন এবং তাদের মতো সমান মর্যাদা এবং সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। তাঁর অনুশাসন আত্ম-পর নির্বিশেষে ন্যায়বিচার ও সমতা সমানভাবে প্রযোজ্য হতো। ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, "হযরত ওমরের সময় গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর বহন করা হয়েছিল সে আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরও সময় লাগবে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

পরামর্শ সভা : হযরত উমর (রা.)-এর মজলিস-উশ-শূরা ছিল আধুনিক বিশ্বের আইনসভার অনুরূপ। মজলিস-উশ-শূরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ছিল- ১. মজলিস-উস-আম (সাধারণ পরিষদ) ও ২. মজলিস-উস-খাস (বিশেষ পরিষদ)।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বিচক্ষণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি, আনসার, মুহাজির, মদিনার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং বেদুইন সরদারদের নিয়ে মজলিস-উশ-আম গঠিত হতো। মদিনার মসজিদে এর অধিবেশন বসত। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাদিসংক্রান্ত বিষয়ে এ পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ, জায়েদ বিন সাবিত, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাবসহ বিশিষ্ট সাহাবিগণ এ পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এবং সংকটময় মুহূর্তে (জরুরি অবস্থায়) খলিফা এ মজলিসের পরামর্শ নিতেন। সৈনিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, বিচারক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি, শাস্তি, যুদ্ধ ও সন্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে খলিফা পরামর্শ নিতেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

রাজস্ব ব্যবস্থা: হযরত উমর (রা.)-এর রাজস্ব ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) আয় ও (খ) ব্যয়। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রাজস্বের উৎস ছিল ৭টি। যথা- ১. আল গনিমত, ২. আল যাকাত, ৩. আল উশর, ৪. আল জিজিয়া, ৫. আল খারাজ, ৬. আল ফাই ও ৭. আল হিমা। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব শত্রুসম্পদ মুসলিম সৈনিকদের হাতে আসত, সেগুলোকে গনিমত বলা হতো। ৪/৫ ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে এবং ১/৫ ভাগ বায়তুল মালে জমা হতো। ১/৫-কে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হতো। মহানবি ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের অংশ দিয়ে সামরিক বাহিনীর সরঞ্জাম এবং অবশিষ্ট অংশ দিয়ে কুরআনের নির্দেশমতো নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাজে ব্যয় হতো। যাকাত একটি শরিয়ত অনুমোদিত কর। কাজেই এর নিয়মকানুন কোনো যুগেই পরিবর্তন হয়নি। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে ঘোড়ার ব্যবসায় লাভজনক হওয়ায় ঘোড়ার ওপর যাকাত ধার্য করা হতো। যাকাত কুরআনের নির্দেশিত খাতে খরচ করা হতো।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

বায়তুল মাল গঠন: বায়তুল মালের পুনর্গঠন হযরত উমর (রা.)-এর একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আবু বকর মদিনায় একটি কোষাগার স্থাপন করেছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় এতে মাত্র এক দিরহাম সঞ্চিত ছিল। অতঃপর ওয়ালিদ-বিন-হিশামের পরামর্শে উমর (রা.) আব্দুল্লাহ-বিন-আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশসমূহ হতে প্রেরিত উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা জমা থাকত। এরপর সব প্রদেশে একটি করে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং একজন করে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

বায়তুল মাল গঠন: বায়তুল মালের পুনর্গঠন হযরত উমর (রা.)-এর একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আবু বকর মদিনায় একটি কোষাগার স্থাপন করেছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় এতে মাত্র এক দিরহাম সঞ্চিত ছিল। অতঃপর ওয়ালিদ-বিন-হিশামের পরামর্শে উমর (রা.) আব্দুল্লাহ-বিন-আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশসমূহ হতে প্রেরিত উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা জমা থাকত। এরপর সব প্রদেশে একটি করে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং একজন করে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ: হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ হলো-১. গরিব, দুঃখী, যাকাত বা কর আদায়কারী, দাসমুক্তি, অপারগ ব্যক্তির ঋণ মোচন, আল্লাহর পথিক এবং পর্যটকদের সাহায্য দান। ২. অসামরিক খাতের ব্যয় নির্বাহ। ৩. সামরিক বিভাগের ব্যয় নির্বাহ। ৪. জনহিতকর কার্যাবলি। ৫. অনাথ ও বেওয়ারিশ শিশুর লালন-পালন এবং ৬. পেনশন ও ভাতা প্রদান।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

বিচার বিভাগ: সুষ্ঠু, ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত উমর (রা.) বিচার বিভাগকে সর্বপ্রথম নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করেন। কাজিগণ সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে কুরআন হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করত। কাজিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বিবাদ নিষ্পত্তি করা, বাদি-বিবাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, অছিয়ত কার্যকরী করা, বিধবা বিবাহ উৎসাহিত ও বন্দোবস্ত করা, নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা, অনধিকার দখলের উচ্ছেদ সাধন করা এবং দুর্বলকে সবলের হাত হতে রক্ষা করা। মসজিদকে বিচারালয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিচারের দিন বাদী, বিবাদী এবং সাধারণ দর্শক উপস্থিত থাকত। বাদী ও বিবাদীকে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুফতি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। হযরত উমর (রা.) ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিজের পুত্রকে ক্ষমা করেননি।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

সামরিক বিভাগ: হযরত উমর (রা.) ছিলেন বিশ্বের প্রথম শাসক, যিনি সকল নাগরিকের প্রতিপালকের দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করেন, তেমনি রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্বও সকল নাগরিকের জন্য অপরিহার্য করেন। প্রয়োজনের সময় সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখা, দেশ জয় ইত্যাদি কারণে হযরত উমর (রা.) সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৯টি জুনুদ বা সামরিক জেলায় (Military districts) বিভক্ত করেন। জুনুদগুলো হচ্ছে-মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, অমুল, ফুসতাত, মিশর, দামেস্ক, হিমস এবং প্যালেস্টাইন। প্রত্যেক সামরিক জেলায় ৪,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী মজুদ থাকত। জুনুদ ছাড়াও প্রধান প্রধান শহর, সীমান্ত এলাকা এবং উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক চৌকি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশুচারণ ক্ষেত্র, সৈনিকের জন্য খাদ্য ও যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম মজুদ থাকত। বেতন প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য জুনুদে অবস্থিত সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করা হতো। এক একটি দলকে ইরাফা বলা হয়। প্রথমদিকে ১০ জনে ইরাফা এবং পরে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় ৪৩ জনে একটি ইরাফা গঠিত হতো। প্রত্যেকটি ইরাফায় মহিলা ও শিশুর সংখ্যাও ছিল অনুরূপ। প্রতিটি ইরাফার ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১,০০,০০০ দিরহাম। ইরাফা 'প্রধানকে আমিরুল আশরাহ প্রতি ১০০ জনে একজন কায়েদ এবং প্রতি দশ জন কায়েদের ওপর একজন আমির নিযুক্ত থাকতেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা

পুলিশ বিভাগ: আধুনিক যুগের পুলিশ বিভাগের অনুরূপ একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হযরত উমর (রা.)। এর নাম ছিল দিওয়াল উল-আহদাস। এর অফিস প্রধান ছিলেন সাহিবুল আহদাস। এর বিভিন্ন কর্মচারিগণ দেশের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ওজন পরীক্ষাকরণ, মদবিক্রি বন্ধকরণ, চুরি-ডাকাতি নিবারণ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকতেন। অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য হযরত উমর (রা.) ৪০০০ দিরহামের বিনিময়ের সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বাড়ি ক্রয় করে কারাগার নির্মাণ করেন।

হিজরি সন প্রবর্তন: হযরত উমর (রা.)-এর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো হিজরি সনের প্রবর্তন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মদিনায় হিজরতকে চিরস্মণীয় করে রাখার জন্য তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন।

হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তেকাল: মদিনার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আবুলুল ফিরোজ নামক জনৈক খ্রিষ্টান পারসিক আততায়ীর হাতে হযরত উমর (রা.) ছুরিকাহত হন। সেদিন ছিল ২৬ হিজরি মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর। এর কয়েকদিন পর ১ মহররম ২৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় খিলাফতের বয়স হয়েছিল ১০ বছর দুই মাস।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্র

সচ্চরিত্র ও অনুসরণীয় আদর্শ: খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সততা, ন্যায় ও সত্যবাদিতা। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র ও সুমহান আদর্শের অধিকারী। তার চারিত্রিক মাধুর্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব উচ্চ প্রশংসিত। তিনি ছিলেন ত্যাগী, নির্লোভ, বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'অদম্য কর্মস্পৃহা ও চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উমর (রা.) ছিলেন তীক্ষ্ণ নীতিজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধসম্পন্ন।

কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ: হযরত উমরের (রা.) চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি অপরাধীদের প্রতি কঠোর ও অসহায়দের প্রতি কোমল ছিলেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাজে ওমর যত শক্ত ও কঠোর আমার উম্মতের মধ্যে তেমন আর কেউ নেই।' অপরদিকে সাম্রাজ্যের গরিব-দুঃখী প্রজাদের প্রতি তার হৃদয় করুণায় বিগলিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ওমর (রা.) গভীর রাতে ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং অসহায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। তার মহানুভবতা নিয়ে অনেক কাহিনি রয়েছে।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্র

ন্যায়বিচারক : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় খলিফা উমর (রা.) ছিলেন আপসহীন। তার কাছে মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। বিচারে উমরের (রা.) পুত্র আবু শাহমা মদপান ও ব্যভিচারের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুসারে তিনি নিজ হাতে তাকে দোররা মেরে হত্যা করেন। তার সম্পর্কে উইলিয়াম মুর বলেন, 'উমরের জীবনচরিত অল্প কথাই আঁকা যায়; সরলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা তার জীবনাদর্শ ছিল এবং নিরপেক্ষতা ও একাগ্রতা ছিল তার শাসনের মূলনীতি।

অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল খলিফা উমর (রা.) ছিলেন অমুসলিম প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার শাসনামলে অমুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারত। তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তাও তিনি দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে উমর (রা.) ইসলামের পরবর্তী খলিফারা যাতে সব জিম্মির প্রতি সম্মান দেখাতে অবহেলা না করেন, সে উপদেশ দিয়ে যান।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্র

অসাধারণ পাণ্ডিত্য : হযরত উমর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বিদ্বান ও বাগ্মী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি কুরআন ও হাদিসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রায় ১০০০ ফেকাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, পরবর্তী ফকিহরা তা সমর্থন করেছেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কিংবদন্তিতে প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে হযরত মুহাম্মদের (সা.) পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে। তিনি মুসলমান লেখকদের দ্বারা তাঁর দান, বিচার এবং অসামান্য সরলতার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।" তাঁদের মতে, "একজন খলিফার যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তার সবগুলো উমরের মধ্যে ছিল। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সমস্ত ধর্মভীরু উত্তরাধিকারীর জন্য ছিল আদর্শ।"

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর কৃতিত্ব

ইসলামের পক্ষে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত প্রাপ্তির মূল্য অপরিসীম। তাঁর খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা, প্রথিতযশা প্রশাসক, বৈপ্লবিক সংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠক, প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি শাসনক্ষেত্রে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে অনন্য কৃতিত্বের নজির রেখে গেছেন।

রাজ্য সম্প্রসারণ: হযরত উমরের-নীতি ছিল আরব জনসাধারণকে একত্র করা। এসব বিবেচনায় তিনি আরবদের বিজিত অঞ্চলে জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর শুধু রাজ্য বিজয়ের কৃতিত্ব পৃথিবীর যেকোনো রাজ্য বিজেতার কৃতিত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের কৃতিত্ব সমসাময়িক সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে হযরত উমর (রা.)-এর কৃতিত্বের নিকট নগণ্য। বহুকাল হতে পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। হযরত উমর (রা.) এ দুই সাম্রাজ্যকেই ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। হিরাক্লিয়াস নিজে নির্দেশনা দিয়েও মুসলিমদের বিজয়ের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি। মুহাম্মদ (স.)-এর পর একটি প্রজন্মের যুগ শেষ হতে মুসলিম সাম্রাজ্য অকসাস থেকে উত্তর আফ্রিকায় সিরটিক মাইনর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর কৃতিত্ব

শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ: রাজ্য বিজেতার কৃতিত্বসহ অন্যান্য সকল কৃতিত্ব বাদ দিলে খলিফা উমর (রা.) ইসলামের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসন প্রবর্তনের কৃতিত্বের জন্য ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি ইসলামি শরিয়তের নিয়মকানুন প্রবর্তন, পুলিশ বাহিনী গঠন, জেলখানা স্থাপন, আদমশুমারি প্রবর্তন, ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা, হিজরি সন গণনা, সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ, দফতর প্রতিষ্ঠা, কৃষি ব্যবস্থা ও চাষিদের অবস্থার উন্নতি বিধান, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যাবলি মহান শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

মজলিস-উস শূরা গঠন: হযরত উমর (রা.) বলতেন, "পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো খিলাফত চলতে পারে না।" তিনি মজলিস-উশ-শূরা নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন। হযরত আলী, উসমান, তালহা, জুবায়ের প্রমুখ নিয়ে গঠিত মজলিস-উস-খাস কর্মচারী, সৈনিক, শাসনকর্তা, বিচারক নিয়োগ ও বদলি ইত্যাদি ব্যাপারে খলিফাকে মতামত দিতেন। রাজস্ব ব্যবস্থায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

# হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)



## হযরত উমর (রা.)-এর কৃতিত্ব

জনকল্যাণ সাধন: প্রজাদরদি শাসক হিসেবে হযরত উমর (রা.) সর্বদা জনগণের কল্যাণ সাধন করেন। নাজরাত-ই- নাফিয়ার তত্ত্বাবধানে উমর তাঁর শাসনকালে ৪,০০০ নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, সরকারি কার্যালয়, পুল, বড় বড় রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য বসরায় আবু মূসা খাল, ইরাকে মা'কিল খাল, পারস্যে সা'দ খাল এবং মিশরে আমিরুল মুমেনিন খাল খনন করেন। তিনি মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ এবং কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি বসরা, কুফা, ফুসতাত, মাসুল, জাজিরা প্রভৃতি বিখ্যাত নগর নির্মাণ করেন। তিনি হিজরি সনের প্রবর্তন করেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন, অভাব - ইত্যাদি অবগত হবার জন্য খলিফা নিজে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। হজের সময় খলিফার কাছে সাধারণ লোক দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার সুযোগ পেত। খলিফার ভয়ে কোনো সরকারি কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে সাহস পেত না। এক কথায় জনসাধারণের কল্যাণই ছিল হযরত উমরের প্রবর্তিত শাসনের মূল লক্ষ্য।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৪ হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

# টপিক ০২: হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাকওয়া এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ১১ বছর ১১ মাস ১৭দিন রাজ্য শাসন করেন। এর মধ্যে প্রথম ছয় বছর ছিল শান্তিপূর্ণ। পরের ছয় বছর বিশেষ করে শেষের দুই বছর ছিল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা। একটি ইহুদি চক্র আল্লাহওয়ালা খলিফার বিরুদ্ধে কতিপয় ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ইসলামি সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ভিত্তিহীন অভিযোগ তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। তাঁর শাহাদাতের ফলে ইসলামি বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



জন্ম ও পরিচয়: হযরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে (কারও মতে ৫৭৬ খ্রি.) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবু আমর ও আবু আব্দুল্লাহ। তিনি মহানবি (স.)-এর দু কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেন বলে তাঁর উপাধি হয় 'যুন্নুরাইন' (দুই রশ্মির অধিকারী।) তাঁর বাবার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। তাঁর মা মহানবি (স.)-এর আপন ফুফি উম্মে হাকিম বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। তাঁর পরদাদা উমাইয়া ইবনে আবদি শামস কুরাইশ বংশের সরদারদের অন্যতম ছিলেন। উমাইয়া রাজবংশ তাঁর নামানুসারেই হয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর উচ্চতা ছিল মধ্যম, গায়ের রং ঈষৎ রক্তিম, নাসিকা উন্নত ও বক্র এবং গণ্ডদেশ ছিল মাংসল। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। দাঁড়ি ছিল ঘন ও লম্বা। জাহিলিয়া যুগে তিনি ছিলেন সৎ, পরোপকারী ও চরিত্রবান। দয়া-দাক্ষিণ্য, উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতার কারণে মক্কায় তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তিনি অত্যধিক লজ্জাশীল ছিলেন। জাহিলিয়া যুগে তিনি সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



ইসলাম গ্রহণ: হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন ইসলাম প্রচার করেন, তখন হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স ছিল ৩৪ বছর। এক রাতে স্বপ্নে তিনি আদিষ্ট হলেন, "উঠো ঘুমন্ত ব্যক্তি, জেগে উঠো, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।" এর অনতিবিলম্বে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।

খলিফা হওয়ার পূর্বে ইসলামের খেদমত: মদিনায় হিজরত করার পর হযরত উসমান (রা.) ইসলামের খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর যাবতীয় ধনসম্পদ ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এদিক দিয়ে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আবু বকর (রা.)-এর পরবর্তী স্থানের অধিকারী ছিলেন। রাসূলে করিম (স.) যখন মুসলমানদের জন্য একটি কূপ খনন করতে চাইলেন, তখন উসমান (রা.) তাঁর জন্য বিশ দিরহাম দান করেন। পুনরায় নবি করিম (স.) যখন মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য এর সংশ্লিষ্ট একখণ্ড জমি খরিদ করতে চাইলেন, তখন উসমান (রা.) নিজ অর্থ দিয়ে তা কিনে দিলেন। তাঁবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যখন গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন, তখন তিনি নগদ দশ হাজার দিনার ও এক হাজার উট দান করেছিলেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটলে কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নির্দেশে তিনি স্ত্রী রুকাইয়া ও একদল মুহাজির নিয়ে ৫ম হিজরিতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। দুই বছর পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় ৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করেন। বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী রোকাইয়া অসুস্থ থাকার কারণে তিনি তাতে যোগদান করতে পারেননি, রাসূলে করিম (স.)-এর আদেশে তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর পাশে ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলে করিম (স.)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। খলিফা আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর আমলে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয় খলিফাই সর্বদা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে উসমান (রা.)-এর নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



হযরত উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচন: খিলাফতে থাকাকালীন হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচক পরিষদ গঠন করেন। হযরত উসমান, হযরত আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ বিন জায়েদ ও আব্দুর রহমান (রা.) প্রমুখ এ পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের খেদমতে এসব সাহাবির অসামান্য অবদান ছিল। এরূপ জটিল পরিস্থিতি আব্দুর রহমান (রা.) সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি হযরত যুবায়ের, উসমান ও আলী (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। এ সময় হযরত তালহা (রা.) মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না। ভোটাভুটির মাধ্যমে হযরত সাদ উসমান (রা.)-কে সমর্থন জানায়। হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এবং হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে সমর্থন জানান। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত আব্দুর রহমান হযরত উসমান (রা.)-কে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা হিসেবে ঘোষণা করলেন। আনসার, মুহাজিরসহ সকলে হযরত উসমান (রা.)-এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

পূর্বাঞ্চল বিজয়: হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে ইরাক, পারস্য, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও আফ্রিকার কিছু অংশ বিজিত হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলেও রাজ্য জয় অব্যাহত থাকে। হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আমির খোরাসানের রাজধানী নিশাপুর দখল করেন। নিশাপুর থেকে শেষ পারস্য সম্রাট মার্ভে পালিয়ে যান। আব্দুল্লাহ মার্ভ দখল করেন। জনৈক ব্যক্তির হাতে পারস্য শেষ সম্রাট নিহত হন (৬৫১)। এরপর মুসলিম বাহিনী বলখ, তাবারিস্তান, হিরাত, কাবুল এবং গজনি দখল করেন। পারস্য শেষ সম্রাট ইয়াজদজারদ ৬৫১ সালে নিহত হওয়ার পর পারস্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং পূর্ব ও উত্তরে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

পশ্চিমাঞ্চল বিজয়: হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তেকালের কারণে পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে হযরত উসমান (রা.) মিশরের শাসক আমর ইবনে আসকে বরখাস্ত করে তাঁর পালিত ভাই আব্দুল্লাহ বিন সাদকে মিশরের শাসক নির্বাচিত করেন। নতুন শাসক সেনাবাহিনীসহ উত্তর আফ্রিকার বারকা ও ত্রিপলি হয়ে কার্থেজের নিকট উপনীত হন। কার্থেজের শাসক ছিলেন গ্রেগরি। এখানে মুসলিম বাহিনীর সাথে কার্থেজের নেতৃত্বে রোমান বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই হয়। লড়াইয়ে রোমান বাহিনী পরাজিত হয় এবং কার্থেজের শাসক গ্রেগরি নিহত হন। এ যুদ্ধ মুসলিম বাহিনী প্রচুর গনিমত লাভ করে। হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে নৌ-অভিযানের সাফল্য ইসলামের ইতিহাসের গৌরবময় কীর্তি। হযরত উসমান (রা.)-এর অনুমতিক্রমে মিশরের শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সাবাহ সর্বপ্রথম নৌঅভিযান পরিচালনা করে সাইপ্রাস দখল করেন ৬৪৯ সালে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

সাইপ্রাসের অধিবাসী রোমান সম্রাটের পরিবর্তে মুসলিমদেরকে একই কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করে। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু কায়েস স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী মিলে প্রায় ৫০টি অভিযান পরিচালনা করে একটি গ্রিক সামুদ্রিক বন্দর আক্রমণের সময় নিহত হন। কয়েক বছর পর রোডস্ দ্বীপ অধিকৃত হয়। সিরিয়া ও মিশর বিজয়ের পর হতে রোমান নৌবাহিনী এসব প্রদেশের উপকূলবর্তী মুসলিম শহরে গোলযোগ সৃষ্টি করত। সিরিয়াবাসীকে নানাভাবে মুসলিমদের বিপক্ষে প্ররোচিত করত। ৬৫২ সালে ৫০০ যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করে রোমানরা মুসলিমদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) মিশরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহকে রোমান নৌবাহিনীকে মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

গণতান্ত্রিক শাসন: ইসলামি সাম্রাজ্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর ধারাকে চালু রাখেন। মজলিস-উশ-খাস ও মজলিস-উস-আমের মাধ্যমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। জনসাধারণের হক পরিপূর্ণভাবে আদায়ে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। তিনি কখনো বান্দার হক নষ্ট করেননি। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের কড়াকড়িভাবে নির্দেশ দিতেন।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ: রাষ্ট্রীয় সীমানা বিশাল হওয়ায় হযরত উমর (রা.) প্রাদেশিক ব্যবস্থা চালু করেন। হযরত উসমান (রা.), হযরত উমর (রা.)-এর প্রাদেশিক ব্যবস্থা বহাল রাখেন। তবে তিনি সিরিয়াকে ৩টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এছাড়া সাইপ্রাস, আর্মেনিয়া ও তিবারিস্তান ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ। তাঁর শাসানমলে পাঁচটি প্রদেশ ছিল তুলনামূলক বড়। এসব প্রদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর ছিল। এসব প্রদেশ হতে অন্যান্য ছোট প্রদেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। তবে প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা আলাদা গভর্নর (ওয়ালী) ছিল।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

সুষ্ঠু বায়তুল মালের ব্যবস্থা: বায়তুল মাল ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার। রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পদের মিশ্রণ হওয়ার সুযোগ ছিল না। তিনি বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানে উকবা ইবনে আমের এবং যায়িদ ইবনে সাবিতকে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পূর্ববর্তী খলিফার নীতি অনুসরণ: হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর অনুসৃত রাষ্ট্রীয় নীতি হযরত উসমান (রা.) বহাল রাখেন। কিছু কিছু বিভাগ ও উপবিভাগগুলোতে তিনি উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা পূর্বের মতো চালু রাখেন। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ আলাদা ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলেও বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। হযরত উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও বৃত্তি সুবিধাভোগীদের বৃত্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## শাসন কার্যাবলী

জনহিতকর কার্যাবলি হযরত উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থাকাকালে বহু জন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি কুরআন শরীফের নির্ভুলতা রক্ষার্থে বিশিষ্ট সাহাবিদের পরামর্শক্রমে আঞ্চলিকভাবে কুরআন শরীফগুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং একই ভাষা ও উচ্চারণ সংবলিত পাণ্ডুলিপি একাধিক কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে কাবা শরিফের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়। জনকল্যাণের জন্য তিনি মসজিদ, সড়ক, গৃহ, মুসাফিরখানা, অতিথিশালা স্থাপন করেন। তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দফতরের জন্য প্রাসাদ তৈরি শুরু হয়।

সামরিক ব্যবস্থা: হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত সামরিক ব্যবস্থা তিনি চালু রেখেছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুমোদনে সেনাবাহিনীর ব্যারাকের সংখ্যা বাড়ানো হয়। ঘোড়া, উট ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি এদের জন্য চারণভূমি সম্প্রসারিত করেন। এছাড়া তাঁর শাসনামলেই প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

হযরত উসমান (রা.) মোট ১২ বছর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বারো বছরের মধ্যে তিনি প্রথম ছয় বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে গোলযোগমুক্তভাবে রাজ্য শাসন করেন। এ সময়ে ইসলামের ইতিহাসে অনেক সোনালি পৃষ্ঠা সংযোজিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষের ছয় বছর তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ ওঠে। যার ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো হলো- ১. স্বজনপ্রীতি, ২. কুরআন শরিফ দগ্ধীভূতকরণ, ৩. বায়তুল মালের অর্থ তছরূপ, ৪. সরকারি চারণভূমি ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার, ৫. আবুজর গিফারিকে নির্বাসন ইত্যাদি প্রধান। নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। আমরা এখন নিরপেক্ষভাবে অভিযোগগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

স্বজনপ্রীতি : হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের অপসারণ করে, নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। কুফায় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে, বসরায় আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরকে, মিশরে তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহকে এবং সিরিয়ার হযরত মুয়াবিয়াকে প্রাদেশিক হিসেবে গভর্নর নিয়োগ করে। প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.)-এর এসব নিয়োগের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনয়ন করা ঠিক ছিল না। কারণ তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য ছিলেন। যেমন- হযরত উমর (রা.) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা হিসেবে ছয় জনের তালিকায় রেখেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যে যোগ্য ও দক্ষ শাসক ছিলেন, তাঁর পরবর্তী রাজ্য শাসনে প্রমাণিত হয়েছে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

কুরআন শরিফ দগ্ধীভূতকরণ: হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীভূতকরণ। বসরা, দামেস্ক, হিম্স, পারস্য ও আজারবাইজানের মুসলমানদের কুরআন শরিফ পাঠ, আবৃত্তি ও উচ্চারণের পার্থক্য দূরীকরণে হুজাইফা ও বসরার শাসক হযরত উসমান (রা.)-কে কুরআন শরিফ সংকলনের অনুরোধ করেন। এ সমস্যা দূরীকরণে খলিফা ৬৫১ সালে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওহি লেখক জায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির পরামর্শ মোতাবেক হযরত উসমান (রা.) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত কুরআন শরিফের পাণ্ডুলিপি যোগাড় করেন। সেগুলোর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর কন্যা ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্ত্রী বিবি হাফসা (রা.)-এর নিকট গচ্ছিত কুরআন শরিফের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। বিশিষ্ট কুরআন হাফেজের সাথে মিলিয়ে সঠিক, নির্ভুল ও প্রামাণিক কুরআন শরিফ সংকলন করা হয়। বাকি কুরআন শরিফগুলো মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে কুরআনের বিধি মোতাবেক পবিত্রতার সাথে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আসলে হযরত উসমান (রা.) যে উদ্যোগ নেন তা ছিল মহৎ এবং সকল সাহাবির মতক্যের ভিত্তিতে। তাঁর এ উদ্যোগে পরবর্তী মুসলিমদের বিশেষভাবে উপকৃত হন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

বায়তুল মালের অর্থ আত্মীয়স্বজনকে দান: হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অন্যতম একটি অভিযোগ ছিল তিনি বায়তুল মালের (সরকারি কোষাগার) অর্থ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের দান করেছেন। তিনি রাজকোষ শূন্য করেছেন এবং সরকারি সম্পত্তি উমাইয়াদের মাঝে বিতরণ করেছেন। ব্যক্তি উসমান (রা.)-কে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন ধনী, দানবীর, খোদাভীরু, ধৈর্যশীল, অমায়িক ও সহনশীল ইত্যাদি। তিনি সহনশীলতার প্রতীক ছিলেন বিধায় রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তাঁর মতো ব্যক্তি সরকারি অর্থ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন না। ঐতিহাসিক তাবারির মতে, তিনি সরকারি অর্থের অপচয় করা তো দূরে থাক, খলিফা হিসেবে বায়তুল মাল হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। হযরত উসমান (রা.)-এর বক্তৃতা হতে ঐতিহাসিক তাবারির উদ্ধৃতি, "আমি. বায়তুল মাল হতে কিছু গ্রহণ করি না, এমনকি আমি যা আহার করি, তা আমার নিজস্ব অর্জিত অর্থ দ্বারা করি।"

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

সরকারি চারণভূমি নিজস্ব কাজে ব্যবহার: বিদ্রোহিগণ অভিযোগ করে যে, সরকারি চারণভূমি খলিফা নিজস্ব পশুচারণের জন্য ব্যবহার করেন। আসলে সত্য ঘটনা হলো সরকারি চারণভূমি সরকারি স্বার্থ ছাড়া হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর আমল থেকে জনসাধারণের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। হযরত উসমান (রা.) পূর্ববর্তী খলিফাদের নীতি অনুসরণ করেছেন মাত্র। সরকারি চারণভূমিতে যেসব উট ও ঘোড়া চরেছিল, সেগুলো সরকারি কাজে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য রক্ষিত উট ও ঘোড়া ছিল। হযরত উসমান (রা.) নিজের ব্যক্তিগত কাজের সরকারি চারণভূমি ব্যবহার করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

আবুজর আল গিফারির নির্বাসন: হযরত উসমান (রা.) আবুজর আল গিফারি নামক একজন বিশিষ্ট বৃদ্ধ সাহাবিকে নির্বাসন দেন। তিনি ধর্মভীরু ও তাপস ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমানদের ধনসম্পদ সঞ্চয়ের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন শরিফের ৯নং সূরার ৩৪নং আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। কুরআন শরিফের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রচার করতে থাকেন যে, ধনসম্পদ সঞ্চয় করার জন্য নয়, এটি জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য। তিনি সিরিয়ায় এ মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। মুয়াবিয়া (রা.) সুকৌশলে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। মদিনাতেও তাঁর বিপ্লবী বাণী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। খলিফা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, যাকাত, উশর, ফেতরাসহ কুরআন শরিফে বর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করে ধনসম্পদ সঞ্চয় করলে দোষের কিছু নেই। আবুজর গিফারি (রা.) তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতে অটল থাকেন। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলিফা তাকে 'রাবাদা' নামক স্থানে নির্বাসন দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তিনি দুই বছর নির্বাসনে থেকে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা এ ঘটনার জন্য খলিফাকে অভিযুক্ত করে। বাস্তবিকপক্ষে খলিফা তাকে নির্বাসন দেননি। রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

কাবাগৃহের সম্প্রসারণ: কাবাগৃহের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় হযরত উমর (রা.)-এর আমলে এবং শেষ হয় হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে ৬৪৭ সালে। কাবাগৃহের সম্প্রসারণের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করতে হয় তাঁরা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে ক্ষতিপূরণ দাবি করেনি। হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে, খলিফা তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি 'হন কিন্তু জমিদাতারা ক্ষতিপূরণ না নিয়ে রাজ্যে অহেতুক গোলমাল শুরু করে। পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে না নিতে পেরে হযরত উসমান (রা.) জমিদাতাদের কারারুদ্ধ করেন। বিদ্রোহীরা হযরত উসমান। (রা.)-এর সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্যমূলক ও হীনস্বার্থে করা হয়েছে বলে দাবি তোলে। এসব বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূক অভিযোগ হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত হয়। অভিযোগগুলোর প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করাই বিদ্রোহী বা অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্য ছিল।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কারণ

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষার্ধে নানা ধরনের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। এসময় জাতিগত বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়গত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আকার ধারণ করে এবং যার প্রতিফলন ঘটে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের কারণসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

কুরাইশ-অকুরাইশ দ্বন্দ্ব: হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬) মোট ১২ বছর রাজ্য শাসন করেন। তার শাসনমলের প্রথম ছয় বছর শান্তিতে অতিবাহিত হলেও দ্বিতীয় ছয় বছর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের মধ্যে কাটে। আব্দুল মান্নাফের ছেলে হাশিম ও আব্দুস শামসের পুত্র উমাইয়ার নামে দুটি গোত্র কুরাইশ বংশের পরিচিতি লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমলে বিরোধ না থাকলেও হযরত উসমান (রা.)-এর আমল থেকে এ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন এবং কুরাইশদের ইরাকে ভূমি প্রদান করেন। সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে একদল স্বার্থান্বেষী মহল এ ধারণা ছড়িয়ে দেয় যে, কুরাইশরা প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভকরেছে। বসরা, কুফা ও মিশরের ফুসতাতে দ্রুত এ ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরাইশ ও অকুরাইশদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কারণ

আনসার-মুহাজিরদের মনোঃকষ্ট: হযরত উমর (রা.) পর্যন্ত আনসার মুহাজিরদের মধ্যে স্বার্থগত বিষয়ে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব বা মনোমালিন্য দেখা দেয়নি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে আনসারগণ নানাভাবে অবহেলিত হতে থাকে। সকল প্রশাসনিক উচ্চপদে মুহাজিরদের নিয়োগ আনসারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষার্ধে আনসার ও মুহাজিরদের মনোমালিন্যের স্বরূপটা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। অনাবর মুসলিমদের মাওয়ালি বলা হতো। মাওয়ালিরা সমাজে আশ্রিত বা অনুগত ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা লাভ করত। তারা ইসলামের খেদমতে আরবীয় মুসলমানদের ন্যায় যুদ্ধ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করেও সমাজে ও রাষ্ট্রে কোথাও ন্যায্য অধিকার লাভ করত না। এজন্য মাওয়ালি তথা অনারবগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এতে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে একটি জনমত গড়ে ওঠে। হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্র একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কারণ

কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ: আরববাসী কেন্দ্রীয় শাসনে অনভ্যস্ত ছিল। এজন্য তারা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে আনুগত্য দেখাতে অস্বীকৃতি জানায়। তৃতীয় খলিফার খিলাফতের শেষার্ধে সীমান্ত যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যায়। ফলে যাযাবর আরববাসী বেকার হয়ে পড়ে। তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস (গনিমত) বন্ধ হয়। ফাইকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে হযরত উমর (রা.) ঘোষণা দেওয়ার কারণে ফাই থেকে মুসলিম সেনাদের আয় বন্ধ হয়ে যায়। তারা ফাই ভূমির সম্পূর্ণ আয় দাবি করেন। হযরত উসমান (রা.) আরব যোদ্ধাদের দাবি মেনে নিতে পারলেন না।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কারণ

খলিফার সরলতা ও উদারতা: হযরত উসমান (রা.)-এর দুর্বল প্রকৃতি তাঁর দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ ছিল। তিনি ছিলেন সহজ-সরল, ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু খলিফা। তিনি রক্তপাত পছন্দ করতেন না। সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর সরলতা ও উদারতা মোটেই পরিস্থিতির উপযোগী ছিল না। তিনি অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধীকেও ক্ষমা করতেন। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের তিনি শক্ত হাতে দমন করতে পারেননি। তাঁর সরলতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে তাঁরই জামাতা ও চাচাতো ভাই মারওয়ান সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন।

জীবিত সাহাবিদের নিষ্ক্রিয়তা: মহানবি (স.)-এর বিশ্বস্ত সাহাবিদের অনেকেই এসময় জীবিত ছিলেন না, যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-কে বিপদের দিনে সৎ পরামর্শ ও সাহায্যদানে এগিয়ে আসেননি। ইসলামের মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি ও জীবিত সাহাবিদের নিষ্ক্রিয়তা হযরত উসমান (রা.)-এর শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করেছিল।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কারণ

হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকদের বিরোধিতা: হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকদের বিরোধিতা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে ইন্ধন জুগিয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর খলিফা নির্বাচনকালে হযরত আলী (রা.) মনেপ্রাণে হযরত উসমান (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর সমর্থকরা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এবং হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে।

আর্থসামাজিক কারণ : হযরত উমর (রা.)-এর আমলে বিখ্যাত পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য দখলে মরুবাসী যাযাবরদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিন্তু তাঁদের আর্থসামাজিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পক্ষান্তরে, ইরাক এবং অন্যান্য উর্বর অঞ্চলে কুরাইশদের জমি প্রদান করা হয়। এর ফলে মরুবাসী আরব যাযাবর কুরাইশদের পদমর্যাদা ও অধিকারের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। যা প্রকারান্তরে ইসলামি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ঘটনা

নানা অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীরা (৭০০ জন) মদিনায় আগমন করে। তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত পোষণ করত। কিন্তু সকল দল একমত ছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করে উমাইয়া বংশের ক্ষমতা বিলুপ্ত করতে হবে। বিদ্রোহীরা প্রদেশের শাসনকর্তাদের স্বার্থপরতা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি ইত্যাদি খলিফার নিকট পেশ করে। হযরত উসমান (রা.) ধৈর্য ধরে তাদের কথা শোনেন এবং আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তাদের দাবি মতো মিশরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন সাদকে অপসারিত করে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে নিয়োগ করেন। বিদ্রোহীরা সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যেতে থাকে। মিশর ফিরে যাওয়ার পথে বিদ্রোহীরা এক অশ্বারোহী দূতের নিকট থেকে খলিফার সিলযুক্ত একটি পত্র উদ্ধার করে। পত্রের সারমর্ম হলো, মিশরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন সাদকে এ মর্মে লেখা যে, যখন বিদ্রোহীরা মিশরে পৌঁছবে তখন তাদেরকে যেন হত্যা করা হয় এবং তাঁর পদচ্যুতির ফরমানটিকে যেন বাতিল মনে করা হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ঘটনা

মিশর থেকে আসা বিদ্রোহীরা কয়েকদিন পর আবার মদিনায় ফিরে আসে। এরপর দেখা যায় বসরা ও কুফার বিদ্রোহীরাও মদিনায় ফিরে আসে। তারা একসাথে হযরত উসমান (রা.)-এর পদত্যাগ দাবি করে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাদকে লেখা খলিফার সিলমোহরযুক্ত পত্রের ব্যাপারে খলিফার নিকট কৈফিয়ত দাবি করে। খলিফা শপথ করে বলেন যে, তিনি পত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বিদ্রোহীরা তখন পত্রের ব্যাপারে মারওয়ানের ওপর দোষ চাপায় এবং মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খলিফার নিকট জোর দাবি করে। খলিফা তাদের এ অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। হজ মৌসুম হওয়ার কারণে মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনেকে মক্কায় ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহীদের শান্ত করতে ব্যর্থ হন। এর সাথে হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবাও বিদ্রোহীদের বোঝাতে ব্যর্থ হন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ঘটনা

হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত জুবায়েরের পুত্রগণ ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করেন খলিফাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। বিদ্রোহীরা খলিফার বাসগৃহ ঘিরে রাখে। তারা খলিফাকে হত্যার হুমকি দেয়। হযরত উসমান (রা.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেন, "মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, তার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি।" শুক্রবারের জুমার নামাজে বিদ্রোহীরা গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে। খলিফা কোনোরকমে নামাজ শেষে গৃহে প্রবেশ করেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ঘটনা

বিদ্রোহীরা অনাহারে ও পিপাসায় খলিফাকে মেরে ফেলার জন্য খাবার পানি বন্ধ করে দেয়। এভাবে দুই সপ্তাহ কেটে যায়। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা জানতে পারেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফার নিরাপত্তার জন্য একটি সেনাবাহিনী মদিনায় প্রেরণ করেছেন। হযরত উসমান (রা.)-এর নিরাপত্তার জন্য ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের নেতৃত্বে গঠিত বাহিনী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহীরা দেয়াল টপকে গৃহে প্রবেশ করে। ১৮ জিলহজ, ৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৭ জুন, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা ৮২ বছর বয়স্ক কুরআন শরিফ পাঠরত খলিফা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করে। খলিফাকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী নায়লা একটি আঙুল হারান। P.ক. Hitti তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেন, "Thus fell the first caliph whose blood was shed by Muslim hands." (এরূপে মুসলমানদের দ্বারা তিনিই প্রথম খলিফা যার রক্তপাত ঘটানো হলো)।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ফলাফল

হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে গতিপ্রবাহ নির্ধারণে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। হযরত উসমান হত্যা ইসলামের অন্য যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী তাঁর হত্যার কারণে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিচে তুলে ধরা হলো-

গৃহযুদ্ধের সূচনা: প্রথম দুই খলিফার আমলে মুসলিমদের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে, তা হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে নষ্ট হয়ে যায়। কুরাইশ-অকুরাইশ, হাশেমীয়-উমাইয়া, আনসার-মুহাজির, আরব-অনাবর ইত্যাদিতে মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল 'Arab Civilization' গ্রন্থে বলেন, "The Murder of Othman was a signal for civil war." (হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের সংকেতস্বরূপ)। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডকে ভিত্তি করে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ফলাফল

খিলাফতের মর্যাদাহানি: তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। এ হত্যাকাণ্ডে খলিফাদের প্রতি জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা শিথিল হয়ে পড়ে। খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর হতে চরিত্রবল অপেক্ষা কূটনৈতিক কলাকৌশল ও তরবারির শক্তিই খিলাফত লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। বিদ্রোহী মুসলিম কর্তৃক একজন খলিফার প্রাণ সংহার দ্বারা যে বেদনাবিধুর নজির সৃষ্টি হলো তা ইসলামের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ম্লান করেছে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ফলাফল

বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পথ ও মতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিয়া, সুন্নি, খারেজি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম হয়। গোত্রভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যেমন- উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ, ফাতেমিয় বংশ। প্রত্যেক বংশ রাজ্যে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে এবং ক্ষমতালাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের অবসান: হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর আমলে খিলাফতকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদায়িত্ব বলে মনে করা হতো। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময় থেকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়াকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রভাবক হিসেবে ধরা হয়। এজন্য খলিফা হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একপর্যায়ে নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দেন এবং রক্তপাত নীতি গ্রহণ করেন। কূটকৌশলে বিজয়ী হয়ে ৬৬১ সালে মুয়াবিয়া খলিফা (শাসক) নির্বাচিত হন। তাঁর ছেলেকে পরবর্তী শাসক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয় এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ফলাফল

বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব: হযরত উসমান (রা.)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যা পরর্তীকালে মুসলিম জাহানকে শতধাবিভক্ত করে। তাঁর হত্যাকাণ্ডের ফলে শিয়া, সুন্নি, খারজি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়।

মদিনার প্রাধান্য বিলোপ: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে মদিনা শরিফের প্রাধান্য বিলোপ হতে থাকে। হযরত আলী (রা.) সাময়িকভাবে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। হযরত মুয়াবিয়ার মাধ্যমে সিরিয়ার দামেস্ককে ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী করা হলে মদিনা একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্র

উসমান (রা.)-এর মধ্যে মানবচরিত্রের সব ধরনের গুণের বিকাশ ঘটেছিল। বনু হাশিম, বনু উমাইয়া এবং অন্যসব গোত্রের কাছে তিনি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি।

সরলতা: সরলতা ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্রের ভূষণ। যেকোনো বিষয়কে তিনি সহজ-সরল দৃষ্টিকোণ হতে দেখতেন। জটিলতা, কূটবুদ্ধি তিনি পছন্দ করতেন না। চলাফেরা, সামাজিক ও জাতীয় লেনদেনে তাঁর সরলতা ফুটে উঠত।। তিনি সাধারণ খাদ্য খেতেন এবং সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন। টাখনুর উপরে পোশাক পরতেন। অহংকার ফুটে ওঠে এমন পোশাক তিনি পরতেন না। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) হতে ১৪৬ খানা হাদিস বর্ণনা করেন।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্র

দানশীলতা: হযরত উসমান (রা.) মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ধনসম্পদের কারণে তাঁকে গনি বলা হতো। দানের ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য সাহাবি থেকে এগিয়ে ছিলেন। ইয়াতিম ও বিধবাদের প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। তিনি বহু ক্রীতদাসকে সরাসরি মুক্তি দিয়েছেন বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়াও তিনি কৃষি জমি থেকে আয় করতেন। তিনি কড়ায়গণ্ডায় হিসাব করে যাকাত দিতেন। ভূমি আয় হতে উশর দিতেন। মসজিদে নববি এবং জান্নাতুল বাকিতে তিনি জমি দান করেছিলেন। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি সরকারি ভাতা নিতেন না। তিনি বহু আত্মীয়স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। জাগতিকভাবে সমস্ত কাজকর্মে জড়িত থাকলেও তাঁর অন্তরাত্মা পরকালের সাথে জুড়ে ছিল।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্র

আল্লাহভীতি: আল্লাহভীতি অর্থ শুধু আল্লাহকে ভয় করা নয়। এর অর্থ হচ্ছে শিরকে জলি ও শিরকে খফি পরিত্যাগ করা, সগিরা কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকা, সন্দেহজনক কার্যাদি হতে দূরে থাকা, বৈধ কাজ পালনে সতর্কতা অবলম্বন করা, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকা, গায়বুল্লাহর কল্পনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি। বর্ণিত সকল বৈশিষ্ট্যগুলো হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যে ছিল। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু নফল ইবাদত করতেন। তিনি দিনে সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাতে কিয়ামুল লাইল ও তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। রাতে কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করতেন। শাহাদাতের আগের রাতে তিনি স্বপ্নে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে দেখেছিলেন। মহানবি (স.) তাঁকে বলেছিলেন, "উসমান, আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।" শাহাদাতের দিন তিনি সত্যি সত্যি রোজা ছিলেন। সেদিন তিনি ২০ জন গোলাম আজাদ করে দেন এবং পায়জামা পরিধান করেন। তিনি সর্বদাই মৃত্যু, কবর ও পরকালের কথা স্মরণ করতেন। তিনি বারবার একটি হাদিস বলতেন।" মৃত্যু হচ্ছে পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ। যদি কেউ প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হয়, তবে বাকি ধাপগুলোতেও উত্তীর্ণ হবে।"

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর কৃতিত্ব

বিজেতা : হযরত উসমান (রা.) আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে ইসলামের যে সম্প্রসারণ শুরু হয়, খলিফা উসমান (রা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তা পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলে। পূর্বে কাবুল ও বেলুচিস্তান হতে পশ্চিমে ত্রিপলী পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়। উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তিনি সিরিয়া, পারস্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। এতে আমলাত

নৌবাহিনী গঠন: হযরত উসমান (রা.)-এর সময় প্রথম নৌবাহিনী গঠন করা হয়। প্রথম নৌঅভিযানের সাফল্য লাভের জন্য মিশরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সাবাহ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন। ২৮ হিজরিতে (৬৪৯ খ্রি.) আবু কায়েসের নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম নৌবহর সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করে। ইবনে আবি সরাহ (আব্দুল্লাহ) মিশরবাসী এবং আলেকজান্দ্রিয়ার আরব যোদ্ধাদের নিয়ে আবু কায়েসের সাথে মিলিত হন। অতি সহজেই সাইপ্রাস হস্তগত হয়। আবু কায়েস স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী মিলে ৫০টি অভিযান পরিচালনা করে একটি গ্রিক সমুদ্রবন্দর আক্রমণের সময় নিহত হন। কয়েক বছরে রোল্স দ্বীপ অধিকৃত হয়।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর কৃতিত্ব

পবিত্র কুরআন শরিফের নির্ভুল সংকলন: পবিত্র কুরআন শরিফের নির্ভুল সংকলন ও সংরক্ষণ ইসলামের ইতিহাসে একটি অমরকীর্তি। কুরআন শরিফের পাঠ, আবৃত্তি এবং উচ্চারণের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের লোকজনের মধ্যে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে জায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের নির্ভুল সংকলন করা হয় এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় সকল রাজ্যে প্রেরণ করা হয়।

জনহিতকর কার্যাবলি: ইসলাম ও জনসাধারণের খেদমত করার জন্য হযরত উসমান (রা.) বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। বাঁধ, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং খাল খনন করে তিনি জনসাধারণের মঙ্গল করেন। মদিনা মসজিদের পুনঃনির্মাণ করে তাতে কাঠের ছাদ ও প্রস্তরের স্তম্ভ সংযোজন করে মসজিদে নববির সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। তিনি পথচারীর জন্য ব্যয় করে সরাইখানা নির্মাণ করেন।

শাসনব্যবস্থা: হযরত উসমান (রা.) পূর্ববর্তী খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রশাসন পরিচালনা করেন। মজলিস-উশ-শূরার মাধ্যমে তিনি সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতি সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদিসের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হতো। ইহুদি, খ্রিষ্টান, সেবিয়ান সকলেই ইসলাম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল।

# হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)



## হযরত উসমান (রা.)-এর কৃতিত্ব

মজলিস-উশ-শূরা: রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ এবং রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে খলিফাকে সাহায্য করার জন্য মজলিস-উশ-শূরা নামে একটি পরিষদ ছিল। মুহাজির, আনসার, বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ, বেদুইন নেতা এবং মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উশ-শূরা গঠিত হতো। প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বিষয়াদি মজলিস-উশ-শূরাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা: হযরত উসমান (রা.) শাসন কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র খিলাফতকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলোকে কয়েকটি জেলা, আবার জেলাগুলোকে মহকুমায় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ওয়ালি বলা হতো। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমরের প্রশাসনিক কাঠামো বহাল রাখেন।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৫ হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

# টপিক ০৫: হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) সকলের অনুরোধে খলিফার পদ গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তাঁকে বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের জের ধরে তখনো বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। এরূপ কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। তিনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন: ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ হযরত আলী মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর ডাক নাম ছিল আবুল হাসান এবং আবু তুরাব (আবু তুরাব অর্থ ধূলিকণা বা মাটির পিতা)। হযরত আলী (রা.) নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মর্তুজা। হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবি (স.)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তাঁর বাবার নাম ছিল আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং মায়ের নাম ছিল ফাতেমা। হযরত মুহাম্মদ (স.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়েই হাশেমি ছিলেন। হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কন্যা ফাতেমাকে দ্বিতীয় হিজরিতে বিবাহ করেন। হযরত ফাতেমার গর্ভে তিন পুত্র হাসান, হুসাইন ও মুহসিন এবং দুই কন্যা যায়নাব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। মুহসিন শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। এ হিসেবে হযরত আলী (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর শ্বশুর ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) মারা গেলে হযরত আলী (রা.) অন্যত্র আবার বিয়ে করেন। হযরত হাসান এবং হুসাইনের বংশধরগণ 'সৈয়দ' নামে পরিচিত। হযরত আলী (রা.) ছিলেন মধ্যম দেহী। তাঁর গায়ের রং ছিল কিছুটা রক্তিম ও চোখ দুটো ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। তাঁর আকর্ষণীয় ও সুন্দর চেহারা ছিল। বুক ছিল প্রশস্ত ও দেহ ছিল খাটো। গালভরা ছিল লম্বা ও চওড়া দাড়ি।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



ইসলাম গ্রহণ: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী (রা.)-এর বয়স যখন ১০ বছর তখন রাসূল (সা.) নবুয়তপ্রাপ্ত হন। মহানবি (স.) যখন আরবের জনগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান তখন হযরত আলী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তিনি বিবি খাদিজা (রা.)-এর পর দ্বিতীয় এবং বালকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর।

ইসলামের সেবা: হযরত আলী (রা.) বালক বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অর্থসম্পদ দিয়ে ইসলামের সেবা না করতে পারলেও ইসলামের সেবায় তাঁর কোনো ঘাটতি ছিল না। তিনি তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা ও শৌর্যবীর্য দ্বারা ইসলামের সেবা করে গেছেন। তাঁর দশ বছর বয়স হতেই তিনি রাসুল (স.)-এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। অসি ও মসি ছিল তাঁর ইসলাম সেবার মাধ্যম। তিনি রাসূল (স.)-এর সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌছায় তখন মহানবি (স.) আল্লাহর পক্ষ হতে মদিনায় হিজরতের নির্দেশপ্রাপ্ত হন। তখন রাসূল (সা.)-এর আমানত হিসেবে গচ্ছিত মালামাল মালিকদের কাছে ফিরে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি মহানবি (স.) মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে নিজের জীবন বিপন্নপ্রায় জেনেও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিছানায় শায়িত ছিলেন। কুরাইশরা রাসূল (স.)-এর বিছানায় হযরত আলী (রা.)-কে দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়। পরের দিন হযরত আলী (রা.) মদিনার উদ্দেশ্য হিজরত করেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



হযরত আলী (রা.)-এর বিবাহ: ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী (রা.) রাসূল (স.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পরিবারে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন নামে তিন পুত্র এবং জয়নাব ও উম্মে কুলসুম নামে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে মুহসিন বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। হাসান ও হুসাইনের বংশধর সৈয়দ নামে পরিচিত। হযরত ফাতিমা (রা.) ২৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) হানাফিয়া গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেন এবং এখানেও তার কয়েকজন পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ইবনুল হানাফিয়া।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



হযরত আলী (রা.)-এর শৌর্যবীর্য: হযরত আলী (রা.) শৈশব থেকেই অসীম সাহসী। তাঁর তেজস্বিতা, শৌর্যবীর্য তাঁকে বীর পুরুষ হিসেবে পরিচিত করেছে। তিনি ছিলেন অসি চালাতে সিদ্ধহস্ত, বীরযোদ্ধা, কৌশলী সমরনায়ক। তাঁর নাম শুনলে কুরাইশদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সব কয়টি যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর পতাকাধারী সেনাবাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি কুরাইশ বীর আমর ইবনে আবদুহকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (স.) তাঁকে 'জুলফিকার তরবারি' উপহার দেন।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম পতাকাবাহী মুসাব ইবনে উমাইয়া নিহত হলে হযরত আলী (রা.) পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি অসম বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবার যুদ্ধে তিনি বনু গোত্রকে পরাজিত করেন, যারা ছিল ইহুদিদের সমর্থক। হুনায়নের যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



তাবুক অভিযানের সময় রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে তিনি মদিনায় অবস্থান করেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল খাইবারে সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজয়। এ দুর্গের ফটক তিনি একাই ভেঙে ফেলেন। যা পরবর্তীতে কয়েকজন শক্তিশালী যুবক মিলেও বহন করতে পারছিল না। এ বীরত্বপূর্ণ কাজের পর রাসূল (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা.) ইসলামি পতাকা বহন করেন। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার করেন এবং সেখানে ব্যাপক সফলতা অর্জনের পর তিনি ইয়েমেনের কাজি হিসেবে নিয়োজিত হন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য রাসুলের করিম (স.)-এর ওফাতের পর যখন মুসলিম জনগণ আবু বকরের (রা.) প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, তখন আলী (রা.) সেখানে হাজির ছিলেন না; কারণ পিতৃ বিয়োগে শোকাতুরা ফাতেমাকে (রা.) সান্ত্বনাদানের জন্য তাঁকে তখন থাকতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি আবু বকরকে (রা.) পূর্ণ সমর্থন দান করেছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম হয়েছিলেন। আরবে যখন কতিপয় ভণ্ডনবি উদ্ভব হলো, তখন তিনি দারুল খিলাফত রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর পর তিনি উমরের (রা.) আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে (রা.) তিনি উমরের (রা.) সাথে বিবাহ দিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি সর্বদা উমরের (রা.) সাহায্যকারী ছিলেন। উসমানের নির্বাচনকালে তিনি উসমানের (রা.) পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং উসমানের (রা.) গৃহ শত্রুবেষ্টিত হলে তিনি তাঁর পুত্র হাসান (রা.) ও হুসাইনকে (রা.) তাঁর গৃহদ্বার পাহারা দেওয়ার জন্য মোতায়েন করেছিলেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত লাভ: খলিফা উসমানের (রা.) মৃত্যুতে আরবের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মদিনায় বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল। নতুন খলিফা সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো মতৈক্য ছিল না। তিনটি বিদ্রোহী দলের মধ্যে মিশরীয়রা ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। মিশরীয়রা হযরত আলীকে (রা.), কুফাবাসীরা যুবাইরকে (রা.) এবং বসরাবাসীরা তালহাকে (রা.) সমর্থন করতে লাগল। কতিপয় নাগরিক এবং অন্যান্য বিদ্রোহী দল, বিশেষ করে আল-আসতারের নেতৃত্বে কুফাবাসী হযরত আলীর (রা.) প্রতি সমর্থন জানাল। এ সমস্ত সমর্থনকারীরা তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে খলিফা পদে নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করল। হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে ইতস্তত করলেন। তিনি তালহা কিংবা যুবাইরের নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে এবং মিশরীয় বিদ্রোহীদের অনুরোধে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি হন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন হযরত আলী (রা.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রথমে হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবাইর (রা.) আলীর বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু পরে বিদ্রোহীদের চাপে পড়ে তারা হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা বলে মেনে নিলেন। হযরত আলী (রা.) এমন এক সংকটজনক মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যখন মদিনা ছিল বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের দখলে। একথা সত্য, হযরত আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য দাবিদার ছিলেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে গৃহযুদ্ধ: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কোন্দল ও দলীয় বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সূচনা হয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের পরিণাম ছিল। এতে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়।

হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি: খিলাফত লাভ করেই হযরত আলী (রা.) ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হন। উত্তেজিত জনতা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে। কিন্তু কতিপয় কারণে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা তখন সম্ভব ছিল না। কারণ এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এতে জড়িত ছিল কুফা, বসরা ও মিশরের সংঘবদ্ধ একটি গোষ্ঠী। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এ অপরাধে শাস্তি প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া বিদ্রোহীদের দলনেতা ইবনে সাবা ছিলেন স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-কে নিযুক্তকারী। তাই তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান সম্ভব ছিল না। এ প্রেক্ষিতে তালহা (রা.), যুবাইর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি জানালেন। পানির কারাদী কোরান তে ১০-(ক) বিগত আমাতে দীপা

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



প্রশাসনিক রদবদল: এ সময় প্রশাসনিক রদবদল সংকটজনক পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে। এক্ষেত্রে খলিফা হযরত আলী (রা.) ইবন-উল আব্বাস ও আল মুগীরার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার স্থলে ইবনে হানিফাকে নিযুক্ত করেন। বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আমীরের স্থলে উসমান-বিন-হানিফকে, মিশরে কায়েস বিন-সাদকে এবং কুফায় নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিরিয়ার শক্তিশালী গভর্নর মুয়াবিয়া খলিফার আদেশ অমান্য করে এবং আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরোধিতা ও উচ্চাভিলাষ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি সিরিয়ায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙুল তিনি সিরিয়ার মসজিদে প্রদর্শন করেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করেন। মূলত এটি ছিল একটি রাজনৈতিক স্লোগান এবং এর নেপথ্যে ছিল মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। যার প্রমাণ সিফফিনের যুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ

ওসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি: মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম গৃহযুদ্ধ ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বীজ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিহিত ছিল। কারণ হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.) যদিও হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু হত্যাকারীদের বিচারে খলিফার বিলম্ব তাদেরকে হতাশ ও অসন্তুষ্ট করেছিল। যদিও খলিফা তাদের দাবির ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবুও এটি ছিল সময়ের ব্যাপার ও তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। এটি তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে।

তালহা ও যুবায়েরের প্রত্যাশা: সৈয়দ আমীর আলীর মতে, তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.) যথাক্রমে বসরা ও কুফার শাসনভার গ্রহণের জন্য খলিফার নিকট প্রস্তাব করলে খলিফা তাদের এ দাবি নাকচ করে দেন। এতে তাঁরা খলিফার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। যদিও এ মতামত সঠিক নয়। কেননা তালহা ও যুবায়ের বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন এবং তারা শুধুমাত্র হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার দাবি করেছিলেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

হযরত আয়েশা (রা.) সংযুক্তি: কোনো কোনো ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তা সঠিক নয়। যদিও তাদের মাঝে একদা ভুল বোঝাবুঝি হয় কিন্তু পরে তা মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) পরিস্থিতির চাপে খলিফার শিথিলভাব দেখে মক্কায় ফেরার পথে বিদ্রোহী তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.)-এর সাথে যোগ দেন। আসলে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ: জুবায়ের, তালহা ও আয়েশা (রা.) ৩,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বসরা দখল করে নিয়েছিলেন এবং বসরায় অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা.) ২০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে কুফার পথে বসরার দিকে রওয়ানা হন। কুফার শাসক আবু মুসা আল-আশয়ারীর কাছে থেকে সাহায্য না পেয়ে খলিফা তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং কুফা থেকে ৯,০০০ সৈন্য নিয়ে মোট ২৯,০০০ (উনত্রিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে বসরায় গমন করেন। হযরত আলী (রা.) শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব পাঠান। হযরত যুবায়ের, তালহা ও হযরত আয়েশা (রা.) এ প্রস্তাব মেনে নেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হযরত আলী (রা.)-কে সময় দেওয়া হবে এবং খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার করা হবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যান।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

ইবনে সাবাহ ও তার সমর্থক ইসলামের ক্ষতি করার কারণে দুই দলের বিভক্ত হয়ে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর শিবিরে অতর্কিতভাবে হামলা করে। রাতের এ আক্রমণের দায়ভার হযরত আলী (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) পরস্পর পরস্পরের ওপর চাপান। এভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। তারিখ ছিল ৯ ডিসেম্বর, ৬৫৬। হযরত আয়েশা (রা.) উটে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। হযরত আয়েশা (রা.) উষ্ট্রের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেন বলে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ বা জঙ্গে জামাল নামে পরিচিত। হযরত আলী (রা.)-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে উষ্ট্রের যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকরের সাথে মদিনায় গমন করেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

ফলাফল: ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলাফল ছিল নেতিবাচক। এটি খিলাফতের মর্যাদা হ্রাস করে। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.) ইরাকের কুফায় ৬৫৭ সালের জানুয়ারি মাসের মদিনা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এর কারণ ছিল কুফায় অধিক সংখ্যায় লোকের বসবাস, সমর্থক বেশি ও মুসলিম রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর তিনি কায়েস ইবনে সাদকে মিশরে, সাহল ইবনে হানিফকে হিজাজে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তাঁর রাজধানী স্থানান্তরের ফলে মদিনাবাসী খলিফাকে সহযোগিতা দানে বিরত থাকে। প্রাদেশিক রাজধানীই রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) কুফা ও বসরায় যেরূপ সমর্থনের আশা করেছিলেন, সেরূপ সমর্থন পাননি। ফলে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

সিফফিনের যুদ্ধের কারণ

হাশেমি ও উমাইয়া দ্বন্দ্ব: মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের দুটি শাখা হাশেমি ও উমাইয়া গোত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। মহানবি (সা.)-এর সময় এ দ্বন্দ্ব সুপ্ত হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) ছিলেন হাশেমি গোত্রের সদস্য, তাই তার খিলাফত লাভউমাইয়াদের ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এসময় আলী (রা.) অদক্ষ উমাইয়াদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করে হাশেমিদের নিয়োগ দেন। তাই মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়ারা আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। এর ফলে দুই গোত্রের শত্রুতা নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, 'ইসলামের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রাধান্য বিস্তারে সিরিয়া ও ইরাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো।'

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

বশ্যতা স্বীকারে মুয়াবিয়ার অসম্মতি: হযরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর অন্যান্য প্রাদেশিক শাসকদের মতো সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে পদত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। এছাড়া আলী (রা.) খিলাফতে আরোহণ করেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও কোষাগারের হিসাব নিতে শুরু করেন। এর ফলে সরকারি সম্পত্তি যাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল তারা সমস্যায় পড়ে। উমাইয়া গোত্রের সদস্যরা, বিশেষ করে মুয়াবিয়া খলিফা উসমান (রা.)-এর সময় বিপুল ধনসম্পত্তি অর্জন করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। খলিফা আলী (রা.) তাদের অবৈধভাবে দখল করা জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। আলী (রা.)-এর নির্দেশ ছিল মুয়াবিয়াসহ উমাইয়া গোত্রের অনেক লোকের স্বার্থের পরিপন্থি।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

মুয়াবিয়ার ক্ষমতালিন্দা মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিলু। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে তিনি এ হত্যাকাণ্ডের সাথে হযরত আলী (রা.) জড়িত ছিলেন বলে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে শুরু করেন। এ প্রচারণার জন্য মুয়াবিয়া নিহত খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তে রঞ্জিত পোশাক ও তার স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল দেখিয়ে সিরিয়ার লোকদের উত্তেজিত করে তোলেন।

উষ্টের যুদ্ধের প্রভাব: উসমান হত্যাকাণ্ডকে মুয়াবিয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে। উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবিকারীদের অন্যতম ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.) তিনি সাহাবি তালহা ও যুবায়েরের সাথে যোগ দিয়ে বসরা দখল করেছিলেন। এর ফলে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ঘটনাও আলী এবং মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বে ইন্ধন জোগায়।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

যুদ্ধের ঘটনা : হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার ধৃষ্টতা, অবাধ্যতা ও খিলাফত লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামক স্থানে উপস্থিত হন। মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা.)-এর সামরিক প্রস্তুতির খবর পেয়ে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে একই স্থানে আসেন। হযরত আলী (রা.) মুসলিম সৈন্যের জীবনহানির চিন্তা করে মুয়াবিয়ার নিকট শান্তির প্রস্তাব নিয়ে ৩ জন দূত প্রেরণ করেন কিন্তু মুয়াবিয়ার ঔদ্ধত্যের কারণে কোনো পরিবর্তন হলো না। তখন যুদ্ধ এড়ানোর চিন্তায় হযরত আলী (রা.) মল্লযুদ্ধের আহ্বান করলেন। কিন্তু মুয়াবিয়া কোনো সাড়া দিল না। তাই বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সীমিত আকারে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে শুরু করেন। বেশকিছু দিন খণ্ডযুদ্ধের পর ২৬ জুলাই, ৬৫৭ সালে উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধে বেগতিক অবস্থা দেখে সেনাপতি আমর ইবনুল আসের পরামর্শে মুয়াবিয়া বর্শার ফলকে কুরআন শরিফের পাতা আটকে ঘোষণা দেন যে, কুরআন শরিফের বিধান মতে উভয়ের মাঝে সমস্যার সমাধান হবে। হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার চতুরতা ও ধূর্তামি বুঝতে পারলেন কিন্তু তাঁর বাহিনীর কুরআনে হাফেজ সৈন্যদের অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ করেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

সালিসি নিয়োগের প্রস্তাব: মুয়াবিয়া আমর আল-আসের পরামর্শে পরাজয় এড়াবার জন্য বর্শা ফলকে কুরআন শরিফ ঝুলিয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেন। যুদ্ধ বন্ধ হলে হযরত আলী (রা.) তাঁর প্রধান সেনাপতি আসতারকে মুয়াবিয়ার নিকট সমস্যা সমাধানের পথ জানার জন্য পাঠালেন। মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, "আমরা প্রত্যেকে একজন করে সালিস বা মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করব এবং তাঁরা কুরআনের নির্দেশিত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের বিরোধ মীমাংসা করবেন।"

দু'মার মীমাংসা : হযরত আলী (রা.) তাঁর পক্ষ থেকে মধ্যস্থতা করার জন্য আবু মুসা আল-আশয়ারীকে নির্বাচন করেন। আবু মুসা আল-আশয়ারী অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুফার শাসক ছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে সৈন্যসহ অংশগ্রহণ না করার জন্য খলিফা তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। তবুও তিনি হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষের মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হলেন। সঙ্গে আলীর পক্ষ থেকে ৪০০ জন সাক্ষী দেওয়া হয়। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর পক্ষ থেকে মিশর বিজয়ী প্রধান সেনাপতি আমর-ইবন-আল আসকে নির্বাচন করেন। P.ক. Hitti বলেন, "Amr Ibn-Al-Ash who has been dubbed a political genius of the Arabs." (History of the Arabs-181) (আমর-বিন আল-আসকে সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিভাবান বলে অভিহিত করা হয়) সাক্ষী হিসেবে ৪০০ ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

যুদ্ধের ফলাফল

মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট: দুমাতুল জন্দলের সালিসের রায় মুসলিম জাহানে অনৈক্য তৈরি করে। এতে অযৌক্তিকভাবে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে খলিফার সমকক্ষ করা হয়েছে। এ সালিসে যৌক্তিক সমাধান না হওয়ায় মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এর ফলে একক অপ্রতিরোধ্য মুসলিম শক্তি তাৎক্ষণিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা- ১. আলী (রা.)-এর সমর্থক বা শিয়া, ২. মুয়াবিয়ার দল ও ৩. খারেজি সম্প্রদায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে আরও অনেক দল-উপদলের সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভক্ত হয়ে যায়।

খিলাফতের মর্যাদা লোপ: সিফফিনের যুদ্ধ ও দু'মাতুল জন্দলের রায়ের ফলে খিলাফতের মর্যাদা লোপ পায়। দুমা'র মীমাংসা গ্রহণ করার ফলে খলিফাকে নানা প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর পূর্বে মুয়াবিয়া একজন ন্যায়সংগত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গভর্নর ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মিশর ও সিরিয়ার যাবতীয় কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব মুয়াবিয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে হযরত আলী তাঁর সাথে এক সন্ধি সম্পাদন করে খিলাফতকে সঙ্কুচিত করেন। ফলে খলিফার ওপর এবং খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোপ পায়।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

খারেজিদের উদ্ভব: খারেজি শব্দের অর্থ দলত্যাগী। দু'মাতুল জন্দলের সালিসের রায়ে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে তারা 'লা হুকমা ইল্লাল লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোনো বিধান নেই' ঘোষণা দিয়ে খলিফার দল ত্যাগ করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। খলিফার দল ত্যাগ করায় এরা খারেজি বা দলত্যাগী নামে পরিচিত। তারা কখনো কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ঐতিহাসিক খোদা বকশ্-এর মতে, "ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে খারেজি নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।"

আলী (রা.)-এর কূটনৈতিক পরাজয় ও মুয়াবিয়ার শক্তি বৃদ্ধি: দু'মাতুল জন্দলের রায় হযরত আলী (রা.)-এর জন্য কূটনৈতিক পরাজয় ছিল। মুয়াবিয়া ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। অথচ সালিসে তাকে খলিফা আলী (রা.)-এর সমকক্ষ করে তোলা হয় এবং আলীকে একজন মিথ্যা খিলাফতের দাবিদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবে আলী (রা.)-এর মর্যাদা কমে যায় এবং মুয়াবিয়া আরও শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে নিজেকে প্রদর্শন করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'আলী (রা.)-এর মতো খলিফার সাথে তার (মুয়াবিয়ার) চুক্তি হওয়ায় তার সম্মান বেড়ে আলী (রা.)-এর সমান হলো, পাশাপাশি আলী (রা)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো।"

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## সিফফিনের যুদ্ধ, ২৬ জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ: দু'মাতুল জন্দলের সালিসি বৈঠক এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত নানা পরিস্থিতির কারণে খলিফা হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার সাথে একটি সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এ সন্ধি মোতাবেক সিরিয়া ও মিসর মুয়াবিয়ার শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। মুসলিম জাহান থেকে সিরিয়া আলাদা হলে খিলাফতের বিভক্তি ঘটে। খলিফা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার গৃহযুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সংহতি, ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য ছিল এক সুদূরপ্রসারী অশনি সংকেত। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমারের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'যদি আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ না হতো এবং ইসলামের পরবর্তী যুগ গোলযোগবিহীন হতো তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আরও প্রীতিকর ও সম্ভবত অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হতো।'

রাজতন্ত্রের উদ্ভব: ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সাথে সাথে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। পি. কে. হিট্টি বলেন, '৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলীর মৃত্যুর সাথে সাথে আবু বকর (৬৩২)-এর হাত ধরে খিলাফতের যে প্রজাতন্ত্রী যুগের সূচনা হয়েছিল তা শেষ হয়।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

দু'মাতুল জন্দলের রায় প্রহসনে রূপ নেয়। হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) স্ব-স্ব পদে বহাল থাকেন। হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকগণ শিয়া ও খারেজি দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। শিয়াগণ হযরত আলী (রা.)-কে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং খারেজিগণ দু'মাতুল জন্দলের রায়কে বাতিল করে পুনরায় মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

খারেজি: খারেজি শব্দের অর্থ দলত্যাগী। দুমাতুল জন্দলের রায় প্রহসনে রূপ নিলে আলীকে (রা.)-এর পক্ষের একদল লোক পুনরায় যুদ্ধ করতে চায়। হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ করতে সম্মত না হলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে দল ত্যাগ করে। এভাবেই খারেজি (বিচ্ছিন্নতাবাদী) নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয়। আব্দুল্লাহ ইবন ওহবার নেতৃত্বে প্রথমে ৪,০০০ এবং পরে ১২,০০০ মুসলিম একত্রিত হয়। প্রথমে তারা হারুরিয়া এবং পরে নাহরাওয়ানে ঘাঁটি স্থাপন করে।

নাহরাওয়ানে যুদ্ধ (৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ): খারেজিদের নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব। তার নেতৃত্বে খারেজিরা যারা তাদের মতবাদের বিরোধিতা করত তাদের হত্যা করে সর্বস্ব লুটপাট করত। খলিফা হযরত আলী (রা.) তাদের দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খলিফা নাহরাওয়ান নামক স্থানে খারেজিদের মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে খারেজিরা পরাজিত হয়। কেউ তওবা পড়ে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যোগদান করে। বাকিরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

শিয়া: শিয়া শব্দের অর্থ দল, বা সম্প্রদায়, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। শিয়া বলতে ফাতেমি বা আলী বংশধরকে বোঝায় না। পারিভাষিক অর্থে শিয়া বলতে শিয়াতু আলী বা আলী (রা.)-এর দল, অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বোঝায়। শিয়াপন্থিদের মতে দেশের প্রধান খলিফা বা ইমাম শুধু আলী (রা.)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁদের বিশ্বাস যে, হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা কখনো ভুল করেন না, তাঁদের গায়েবি জ্ঞান রয়েছে। তাঁরা প্রথম তিন খলিফাকে বিশ্বাস করেন না। মনে রাখা দরকার যে, হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধরগণের কেউই শিয়াদের অনুরূপ আকীদার বিশ্বাসী ছিলেন না। কিংবা তাঁরা কেউ দাবিও করেননি যে, ইসলামের বিধান মোতাবেক তাঁদের বংশ থেকেই একজনকে ইমাম বা প্রধান খলিফা নির্বাচন করতে হবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা একটি জাগতিক বা পার্থিব কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, যুগ, দেশ, জাতি অবস্থা অনুসারে জনগণ প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁদের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনটি দল দেখা যায়। যথা- ইসনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ও জায়েদিয়া।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত বরণ: খারেজিরা আমর ইবন আল-আস, মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে সকল সমস্যার সৃষ্টিকারী হিসেবে দায়ী করে এবং তাঁদের হত্যার পরিকল্পনা করে। নির্দিষ্ট দিনে তারা কুফা, সিরিয়া ও মিশরে-এ তিন ব্যক্তিকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে ফজর নামাজের সময় আমর অসুস্থতার জন্য মসজিদে আসেননি। মুয়াবিয়া (রা.) সামান্য আহত হয়ে রক্ষা পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে হযরত আলী (রা.) গুরুতরভাবে আহত হন (২৪ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) এবং ২৭ জানুয়ারি (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

খারেজি ও শিয়াদের দর্শন: খারেজিরা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) ছাড়া কাউকে ন্যায়সংগত খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন না। হযরত আলী (রা.)-কে ইসলামের শত্রুদের সাথে আপসকামী হিসেবে তারা মনে করে এবং এজন্য তাঁকে (আলীকে) অস্বীকার করে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। চরিত্রবান ও যোগ্য হলে একজন ভৃত্য ও খলিফা নির্বাচিত হতে পারে তারা এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। খারেজিরা মনে করে যে, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ও অন্যান্য
আবশ্যিক করণীয় কর্তব্যাদি সম্পন্ন যারা করে না তারা কাফের। তাদের মতে, কোনো মুসলিম কবিরা গুনাহ করে তওবা না করলে অনন্তকাল ধরে দোজখে জ্বলবে। তারা বিবেকের পবিত্রতা বর্জনকারীকে মুরতাদ (মৃত) বলে বিবেচনা করে। খারেজিগণ ইসলামের এমন একটি শুদ্ধাচারী ও চরমপন্থি সম্প্রদায়, যারা ধর্মে গোঁড়া ও রাজনীতিতে গণতন্ত্রমনা ছিল। অন্যদিকে শিয়াদের মূল দর্শন হলো যে, ফাতেমি বংশোদ্ভূত ছাড়া কেউ সরকার প্রধান হতে পারবেন না।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

হযরত আলী (রা.) খুলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। বিপুল তারুণ্য নিয়ে তাঁর ইসলামের আগমন এবং সারা জীবনব্যাপী ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের তিনি অমর হয়ে আছেন।

সহজ-সরল জীবন: জীবনের শুরু হতে শেষপর্যন্ত হযরত আলী (রা.) অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপন করেছেন। কোনো চাকর ছিল না। তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে গম পিষতেন। তাঁর কোনো দেহরক্ষী ছিল না। দিনে ৫ বার মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করতেন। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে থাকা, খাওয়া, পোশাক ইত্যাদিতে তিনি মহানবি ও প্রথম খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করতেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর অবদান: ইসলামের প্রাথমিক যুগে শত্রুদের কাছে আলী (রা.) আতঙ্ক ছিলেন। তাঁর তেজস্বিতা, অসীম সাহসিকতা, শৌর্যবীর্য ছিল সর্বজনবিদিত। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। বদর যুদ্ধসহ প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পতাকা উড্ডীন রাখা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বদর যুদ্ধে তিনি কুরাইশ নেতা শায়বাকে হত্যা করেন। বদর যুদ্ধের রণকৌশলের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে জুলফিকার তরবারি উপহার দেন।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

সংযম ও সরলতা: জীবনের শুরু হতে শেষপর্যন্ত হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত সহজ-সরল ও সংযমী জীবনযাপন করতেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারই ছিল তাঁর পরিবার। ফাতেমা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর হতে তিনি আলাদাভাবে বসবাস শুরু করেন। একটি সাধারণ খাট, একটি খেজুর পাতার জাজিম, একটি মশক, দুটি কাঁথা এবং দুটি পানির কলস নিয়ে তাঁর সংসার জীবন শুরু হয়। মহানবি (স.) কর্তৃক প্রদত্ত উপহার বিক্রয় করে তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে সংসারের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি গম পিষতেন, পানি উত্তোলন করতেন। সাধারণ ভূসিসহ যবের রুটি কিছু সবজি বা এক কাপ দুধ তিনি আহার করতেন। খিলাফত লাভ করার পরও তাঁর খাদ্যাভাসের কোনো পরিবর্তন ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে গৃহে বসবাস করতেন। গরিব জনগণের বাড়ির সাথে তাঁর বাড়ির কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর গৃহে কোনো দ্বাররক্ষী ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতেন। পাশাপাশি তিনি পাগড়ি পরিধান করতেন। অনেকে তাঁকে দরবেশ খলিফা বলে চিনত। মাটি কাটা, পানি তোলা বা নিজ জুতা সেলাইয়ের মতো কায়িক পরিশ্রম করতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁর গৃহে একটি ছাগলের চামড়ার কার্পেট ছিল। তাঁর সরলতা ও সংযমী জীবনযাপনের ব্যাপারে তাঁর উক্তি ছিল যে, যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, সেই বাড়িতে দামি আসবাবপত্র রেখে লাভ কী?

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

আল্লাহ ভীতি: আল্লাহর ভীতিতে হযরত আলী (রা.) ছিলেন আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস। তিনি নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের সময় মহানবি (স.) তাঁর বিছানায় হযরত আলী (রা.)-কে শুয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট গচ্ছিত আমানতসমূহ যথাযথভাবে মালিককে ফেরত দেন। তিনি প্রতিটি ওয়াক্তে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতেন। কিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ, এশরাকসহ বিভিন্ন নফল নামাজ আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের নামাজের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করে নিতেন। জায়নামাজে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন, তাঁর আত্মা (রূহ) যেন শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান। ধীরস্থিরভাবে, আবেগের সাথে অর্থ বুঝে গভীর ধ্যানে তিনি নামাজ আদায় করতেন। রাগ, টেনশন বা মানসিক অস্থিরতা নিয়ে তিনি নামাজে দাঁড়াতেন না। উহুদের যুদ্ধে একটি তীর এসে তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। নামাজরত অবস্থায় এ তীর তাঁর পা থেকে অপসারণ করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, হযরত আলী (রা.)-এর মাঝে সাহসিকতা, মানবতাবোধ এবং সহিষ্ণুতার গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি একজন উঁচু মানের বক্তাও ছিলেন। আত্মত্যাগ, ন্যায়বিচার, সততা, আন্তরিকতা এবং সত্যপ্রিয়তা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## ইমাম হাসান (রা.)

খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান (রা.)-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে কুফাবাসীর দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হন। মক্কা ও মদিনা অধিবাসীরা ইমাম হাসানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী সিরিয়া ও মিশরের শাসক মুয়াবিয়া তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। ধূর্ত, কপট ও ষড়যন্ত্রকারী মুয়াবিয়া যে চক্রান্তের মাধ্যমে খলিফা আলী (রা.) কে সমগ্র মুসলিম জাহানের আধিপত্য থেকে বঞ্চিত করেন, ঠিক সেভাবেই সহজ, সরল ও কোমলমতি ইমাম হাসান (রা.)-কেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার অসৎ পরিকল্পনায় মত্ত হলেন এবং অবিলম্বে হাসান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কুফায় সৈন্য প্রেরণ করেন। হাসান (রা.) মুয়াবিয়ার বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য কায়েসের নেতৃত্বে ১২,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কায়েস যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যখন মুয়াবিয়ার বাহিনীকে ধরাশায়ী করছিলেন, তখন ধূর্ত মুয়াবিয়া কায়েসের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে দিলেন। এর ফলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেল। তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল এবং লুটতরাজ শুরু করল। চপলমতি ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীর এরূপ আচরণে ইমাম হাসান (রা.) বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কুফায় ফিরে আসেন। কুফাকে তিনি নিরাপদ মনে না করে পারস্যের রাজধানীতে চলে আসেন। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে মুয়াবিয়ার কাছে আপস-মীমাংসার জন্য সন্ধির প্রস্তাব করেন। শেষপর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। সন্ধির শর্তানুসারে-

# হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)



## ইমাম হাসান (রা.)

১. ইমাম হাসান (রা.) তার জীবদ্দশায় মুয়াবিয়াকে খলিফা বলে মেনে নিতে সম্মত হন। তবে শর্ত থাকে যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসান (রা.)-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসাইন (রা.) খিলাফত পাবেন।

২. ইমাম হাসান (রা.)-এর পারিবারিক ব্যয়ের জন্য তার জীবদ্দশায় কুফার রাজকোষ থেকে বার্ষিক ৫০ লাখ দিরহাম হারে নিয়মিত ভাতা পাবেন। এছাড়া ইমাম হাসান (রা.) পারস্যের আহওয়াজ জেলার রাজস্ব ভোগ করবেন।

৩. নামাজের খুতবায় হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অভিসম্পাত বন্ধ করতে মুয়াবিয়া সম্মত হন।

সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষ মেনে নিলে ইমাম হাসান (রা.) সপরিবারের মদিনায় গমন করেন। কিন্তু মদিনায় তিনি বেশিদিন নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারেননি। ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের চক্রান্তে স্বীয় স্ত্রী জায়েদা কর্তৃক বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসান (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। অপরদিকে মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন।

মূলত সহজ-সরল ও দুর্বলচিত্তের ইমাম হাসান (রা.) ধূর্ত মুয়াবিয়ার চালবাজি ও কূটনীতির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। চঞ্চল ও অস্থিরমতি কুফাবাসীর উপর নির্ভরতাও ইমাম হাসান (রা.)-এর বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৬ খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ

# টপিক ০৬: খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



মহানবি (স.)-এর ইন্তেকালের পর পর চার জন খলিফা তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে শাসন করেছেন। এ চারজন খলিফার শাসন ছিল মহানবি (স.)-এর আদর্শ ও নীতির প্রতিকৃতি। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও রাষ্ট্রের শাসন কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন বলে তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্যপথগামী বলা হয়ে থাকে। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন বলে সমাজে কোনো শ্রেণি বৈষম্য ছিল না। জনসমাজে সুখশান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ইহকালে ও পরকালে মানবতার কল্যাণ সাধন করা।

খলিফা : হযরত মুহাম্মদ (স.) ধর্মবেত্তা, আইন নির্দেশক, ধর্মীয় নেতা, প্রধান বিচারক, সামরিক বাহিনীর প্রধান ও রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রবর্তন ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উত্তরাধিকারকে খলিফা বলা হয়। খলিফাগণ কুরআন শরিফ ও হাদিসের নির্দেশিত ইসলামি রাষ্ট্রের রূপকার ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো ও নির্দেশিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করাই ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



শাসনব্যবস্থা : ধর্মপ্রাণ খলিফাদের আমলের শাসনব্যবস্থা মূলত দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর অমর সৃষ্টি। তাঁর শাসনামল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) শাসন সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি প্রশাসনিক সুবিধার জন্য গোটা সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশ বিভক্ত করেন। সেগুলো হলো- মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, আল জাজিরা, আল বসরা, আল-কুফা, মিশর, প্যালেস্টাইন, পারস্য, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, সিজিস্তান এবং আজারবাইজান। রোমান শাসনামলে জেরুজালেম ১০টি জেলায় বিভক্ত ছিল। খলিফা উমর (রা.) জেরুজালেমকে প্রধান ২টি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একজন করে ওয়ালি নিযুক্ত করেন। তাদের রাজধানী ছিল রামালা ও আইলা। মিশরকে তিনি উচ্চ মিশর ও নিম্ন মিশর এ দুই অঞ্চলে বিভক্ত করেন। উচ্চ মিশরকে আস সাঈদ বলা হতো। ইবনে আবি সাবাহ ছিলেন এর প্রথম প্রদেশ পাল। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পারস্যে সাসানি আমলের ৬টি প্রদেশ হুবহু রাখা হয়েছিল। খুলাফায়ে রাশেদিনের খিলাফত ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার একটি কাঠামো নবরূপ লাভ করে। উক্ত ভিত্তির ওপর হযরত মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক ও অন্যান্য খলিফাগণ উন্নতমানের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা: মহানবি (স.) আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে উপযুক্ত প্রশাসন নিয়োগ করেন। হযরত ওমরের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলোকে আবার জেলা ও আঞ্চলিক ইউনিকে বিভক্ত করা হয়। শূরার অনুমোদনক্রমে ওয়ালি, আমিল (জেলার শাসনকর্তা) ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত হতো। ওয়ালিগণ ছিলেন স্ব-স্ব প্রদেশে খলিফার প্রতিনিধি। প্রদেশে ওয়ালিদের দায়িত্ব খলিফার অনুরূপ ছিল। ওয়ালি ও আমিলদেরকে বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হতে হতো। নিযুক্তির সময় তারা নিজেদের সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ দিতেন। পরবর্তীকালে তাদের সম্পত্তি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেলে তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হতো। ফলে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের অবকাশ ছিল না। খলিফা উমর প্রদেশগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও পরবর্তী খলিফাদ্বয় তা করতে ব্যর্থ হন। তাদের সময় কেন্দ্র হতে প্রদেশের যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় তারা তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন বলে খুলাফায়ে রাশেদিনের পতন ঘটে।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



রাজস্ব ব্যবস্থা: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমলে যে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিম্নলিখিত উৎস হতে রাশেদিনের আমলে রাজস্ব সংগৃহীত হতো এবং যা বায়তুল মালে বা রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগারে সঞ্চিত রাখা হতো। যেমন- ১. যাকাত ২. জিজিয়া (নিরাপত্তামূলক সামরিক কর), ৩. ঘুমস্ (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ), ৪. উশর (মুসলমানগণ কর্তৃক প্রদেয় ভূমিকর), ৫. খারাজ (অমুসলমান কর্তৃক প্রদেয় ভূমিকর), ৬. আল ফে (রাষ্ট্রীয় ভূমি কর) এবং ৭. উশূর (বাণিজ্য কর)। প্রত্যেক বিত্তশালী মুসলমানদের নিকট হতে যাকাত আদায় করা হতো। এর আদান-প্রদান বিষয়ক আইনকানুন স্বয়ং মহানবি (স.) নির্দিষ্ট করে যান।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে উক্ত বিধানই অনুসরণ করা হয়। প্রথমদিকে ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত ধার্য করা হয়নি; তবে সময় ও অবস্থা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ঘোড়ার ওপরও যাকাত ধার্য করেন। অমুসলমানদের (জিম্মিদের) কোনো প্রকার সামরিক কর ছিল না এবং সেজন্য তাদেরকে জিজিয়া বা প্রতিরক্ষা কর দিতে হতো। তাদের জানমালের নিরাপত্তা ও হেফাজতের জন্য এ কর নেওয়া হতো। মহানবি (স.)-এর সময়ে অমুসলমানগণ ১ দিনার হারে বার্ষিক জিজিয়া কর প্রদান করতেন। হযরত উমরের সময়ে প্রত্যেক ধনী অমুসলমান ৪ দিনার, মধ্যবিত্ত ২ দিনার এবং দরিদ্রকে ১ দিনার হারে বার্ষিক জিজিয়া কর প্রদান করতে হতো। তবে অমুসলিম নারী, বৃদ্ধ, শিশু, উন্মাদ, সন্ন্যাসী, অক্ষম এবং যারা সামরিক বিভাগে কাজ করতেন, তারা এ কর হতে মুক্ত ছিলেন। যুদ্ধে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিকে বলা হতো গনিমাহ। এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাজকোষে (বায়তুল মালে) জমা হতো এবং বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা.)-এর বণ্টন ব্যাপারে সামান্য পরিবর্তন করেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



বায়তুল মাল: হযরম উমর (রা.)-এর বায়তুল মাল বলতে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থাতে বোঝাত। তখন এটিকে কোনো প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হতো না। রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ কম থাকায় রাজস্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে তা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর সময় ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃতির ফলে বিজিত অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় হতে থাকলে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য বায়ুতল মাল গঠিত হয় এবং ওয়ালিদ ইবনে হিশামের পরামর্শে আব্দুল্লাহ ইবন উল আরফানকে প্রথম কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। মদিনা ও নবগঠিত প্রদেশসমূহেও বায়তুল মাল স্থাপন ও অপরাপর কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



দেওয়ান: সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে বায়তুল মালের বণ্টনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তখন হযরত ওমর (রা.) রাজস্ব গ্রহণ ও পুনর্বণ্টনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি রাজস্ব বিভাগ বা 'দেওয়ান' প্রতিষ্ঠা করেন। একে দেওয়ান-উল-খারাজও বলা হতো। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখাই ছিল এই বিভাগের প্রধান কাজ। বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয়ের পর সরকারের হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তা ভাতা হিসেবে আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিও অনুসরণ করা হতো। ভাতা গ্রহণকারীদের তালিকা প্রণয়ন করে ভাতা প্রদান করা হতো। যেমন:

| | |
|---|---|
| রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিধবা পত্নীগণ | ১২,০০০ দিরহাম |
| বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী | ৫,০০০ দিরহাম |
| উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী | ৪,০০০ দিরহাম |
| মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী | ৩,০০০ দিরহাম |
| হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে রাজ্য বিজয়ে অংশগ্রহণকারী | ২০০-৩০০ দিরহাম |

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



বিচার বিভাগ: খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে বিচার বিভাগ ছিল অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুগঠিত। খলিফা ছিলেন প্রধান বিচারপতি। হযরত আবু বকরের খিলাফতে নিযুক্ত শাসনকর্তারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। খলিফা উমর (রা.) বিচার বিভাগকে আধুনিক ন্যায় শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন। খলিফা ছিলেন প্রধান বিচারপতি। মজলিস-উশ-শূরা কর্তৃক নির্বাচিত বেসামরিক বিচারকদের দ্বারাই বিচারকার্য সম্পন্ন হতো। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন বিচারপতি ও জেলাগুলোর জন্য কাজি নিয়োগ করা হতো। সততা, বংশমর্যাদা, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসে পারদর্শিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিচারক নিয়োগের মাপকাঠি ছিল। যেকোনো প্রশাসনিক বা সামরিক কর্মকর্তার চেয়ে কাজিগণ উচ্চতর বেতন পেতেন। তাদের উপাধি ছিল হাকিম। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই ছিল সমান। অমুসলিমদের বিচার তাদের ধর্মীয় আইন দ্বারা সম্পাদিত হতো। আল ইফতাহ নামে বিচার বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে বিনা ফিতে জনগণকে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হতো। কাজিগণ খলিফার কাছে জবাবদিহি করতেন ও তার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



সামরিক বাহিনী: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে মুসলিম সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও বিশাল। হযরত আবু বকরের আমলে সেনাবাহিনী ছিল অবৈতনিক ও স্বেচ্ছাসেবী। আবু বকর (রা.)-এর আমলে স্বধর্মত্যাগীদের দমন ও হযরত উমরের বহির্বিজয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। প্রশাসনিক বিভাগ ছাড়াও সাম্রাজ্যকে নয়টি জুনদে অর্থাৎ সামরিক বিভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো ছিল মদিনা, কুফা, বসরা, দামেস্ক, মসুল, ফুসতাত, হিমস ও প্যালেস্টাইন। এছাড়া রামাল্লা, গাজা, এডেন, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থানে সামরিক ছাউনি, দুর্গ ও ঘাঁটি নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে সামরিক নিবাসকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। প্রত্যেকে সেনানিবাসে আস্তাবল ও খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সামরিক জেলায় এক বা একাধিক সামরিক সেনানিবাস বা গ্যারিসন ছিল। পদাধিকার বলে খলিফা ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তিনি নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। খলিফাগণ বীরযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে সেনাধ্যক্ষও নিয়োগ করা হয়।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



সেনাবাহিনী পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীকে বলা হতো মোকদ্দমাতুল জাইশ। যুদ্ধের সূচনা করাই ছিল এদের দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হতো কলব, প্রধান সেনাপতি এদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকতেন। ডান পাশের বাহিনীকে বলা হতো মায়মানা ও বাম পাশের বাহিনীকে বলা হতো মায়সায়া। পশ্চাতের বাহিনীকে বলা হতো সাকাহ। পাঁচটি ভাগে বিভক্ত এ সেনাবাহিনীকে বলা হতো খামিস। প্রত্যেকটি ইউনিটের প্রধানকে আমির বলা হতো। তিনি সেনাপতির ফরমান অনুসারে নিজ নিজ ইউনিট পরিচালনা করতেন।

হযরত উমর (রা.) পদাতিক, তিরন্দাজ ও অশ্বারোহী এ তিন শ্রেণির বাহিনী গঠন করেন। প্রতিবছর ৩০০০ নতুন জোয়ানকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হতো। স্বাস্থ্যকর স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হতো। সেনাবাহিনীর জন্য চিকিৎসক রাখার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিকে সৈন্যগণকে উসুর হতে ও পরে তাদেরকে উসুর ও বিভিন্ন কর হতে বেতন দেওয়া হতো। এছাড়াও তার গনিমাতের অংশ পেতেন। সৈনিকগণ গড়ে বার্ষিক প্রায় ৬০০ দিরহাম বেতন পেতেন। সৈন্যদের পরিবারবর্গ দিওয়ান থেকে ভাতা পেতেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



নৌবাহিনী: ইসলামের প্রথম দুই খলিফার শাসনামলে নৌবাহিনী সংগঠনে বিশেষ প্রয়োজন হয়নি বলে সেদিকে নজর দেওয়া হয়নি। তাছাড়া হযরত উমরের নৌযুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল। বলাবাহুল্য যে, নৌবাহিনী ব্যতীত পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চল দখল করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমারেখা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে নৌবাহিনীর গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। হযরত উসমানের খিলাফতে মুয়াবিয়া ও আবদুল্লাহ বিন কায়েসের পরামর্শে একটি ক্ষুদ্র নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করা হয়। আবদুল্লাহ বিন কায়েসকে নৌঅধ্যক্ষ বা আমির আল বহর নিযুক্ত করা হয়। আফ্রিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে সিন্ধুর বন্দর দেবল (থাট্টা) আক্রমণে মুগিরাকে প্রেরণ করা হয়। বোম্বাই উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহেও মুসলিম নৌবহর প্রেরিত হয়েছিল।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



মজলিস-উশ-শূরা: খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনো সৈনিক জিহাদের ময়দান হতে পালালে তার নাম মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে টানিয়ে দেওয়া হতো। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে খলিফাগণ মজলিস-উশ-শূরার পরামর্শ' নিতেন। মহানবি (স.) ও হযরত আবু বকরের সময়ে সীমিত আকারে এ সভা ছিল। তবে উমর (রা.) মজলিস-উশ-শূরাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। কুরআনের শিক্ষা হতেই এর উৎপত্তি। শূরার গঠন সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট বিধিবিধান ছিল না। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর বিশিষ্ট সাহাবি, বেদুঈন গোত্রের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উশ-শূরা গঠিত ছিল। মসজিদে নববিতে প্রতি শুক্রবার এর নিয়মিত অধিবেশন বসত। ফলে এ পরিষদ একাধারে দেশের শাসন পরিষদ ও খলিফার মন্ত্রণাপরিষদ হিসেবে কাজ করত। তবে জরুরি অবস্থায় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন-ভাতা নির্ধারণ, বৈদেশিক নীতি গ্রহণ, যুদ্ধ পরিচালনা, বিভিন্ন দফতরের কার্যাবলি নিরীক্ষা ইত্যাদি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াদি এ সভার পরামর্শে সিদ্ধান্তে নেওয়া হতো।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



শিক্ষা: খলিফাগণ শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট নজর দেন। প্রতিটি মসজিদের সংলগ্ন করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব মাদ্রাসায় কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কারিগণ খিলাফতের সর্বত্র ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখতেন। হযরত উমরের সময় থেকে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সকল স্তরের জনগণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও আইন, ফিকহ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, গণিত, দর্শনচর্চা শুরু হয়। বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করত। সিরিয়ার একটি বিদ্যালয়ে ১৬০০ ছাত্র ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর প্রচেষ্টায় বসরা ও কুফা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। খলিফাগণও কাব্যচর্চা করতেন। তদানীন্তন বিশ্বে আরবীয় কাব্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

পুলিশ বিভাগ: খিলাফতের প্রথমার্ধে জনগণকেই পুলিশের কর্তব্য পালন করতে হতো। খলিফা উমর (রা.) সর্বপ্রথম রাত্রিকালে পাহারা ও টহল দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। হযরত উমর (রা.) পুলিশ বাহিনী গঠন করতে না পারলেও দিওয়ান আল আহদাত নামে একটি বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর কার্যক্রম অনেকটা অনুরূপ ছিল। এছাড়া অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনিই মুসলিম ইতিহাসে সর্বপ্রথম কারাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতে একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়। এ বিভাগ শূরতা নামে পরিচিত ছিল। এর প্রধানকে সাহিবুল শূরতা বলা হতো। প্রত্যেকটি প্রদেশ ও শহরে এ বাহিনী প্রতিষ্ঠা হয়। পুলিশ বাহিনী শান্তি বজায় রাখা ছাড়াও হাটবাজারে ওজন ও মাপ পর্যবেক্ষণ, অপরাধ দমনে নিয়োজিত ছিল। কয়েক সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিয়ে এ বিভাগ গঠিত হয়।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



ওয়ালি ও আমিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য: প্রদেশের গভর্নরকে ওয়ালি এবং জেলার প্রধানকে আমিল বলা হতো। হযরত উমর (রা.) নানা গুণাবলি যাচাই-বাছাই করে নিয়োগপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ দিতেন। নিয়োগের সময় দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ইত্যাদি জানিয়ে দেওয়া হতো। খলিফার সিলমোহর ও স্বাক্ষর ছাড়াও সাক্ষী হিসেবে কয়েকজন আনসার ও মুহাজিরদের স্বাক্ষর নেওয়া হতো। প্রথমদিকে ওয়ালি সামরিক প্রধান, ধর্মীয় প্রধান এবং প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে নিজে মজলিস-উশ-শূরার মাধ্যমে কাজি নিয়োগ দিতেন।

আমিল তাঁর জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করতেন। এককথায় ওয়ালির সহায়তাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রতি হজের সময় ওয়ালিদের রাজধানী মদিনাতে উপস্থিত হয়ে বার্ষিক হিসাব-নিকাশ দিতে হতো।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



গুপ্তচর প্রথা: মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য হযরত উমর (রা.) গুপ্তচর প্রথা চালু করেন। খলিফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত গুপ্তচরগণ সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের বিবরণ তাঁর নিকট পেশ করতেন। জনস্বার্থ, রাষ্ট্র ও নীতি বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ পেলে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এর ফলে দুর্নীতি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে ওয়ালি প্রশাসন মুক্ত থাকত।

সামাজিক জীবন : খুলাফায়ে রাশেদিন খলিফা পদকে পার্থিব ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে মনে করতেন। তারা খিলাফতের দায়িত্বকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে মনে করতেন। এজন্য খিলাফতের পূর্বের ও পরের জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁরা ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রীতিনীতি, ভাবধারা এবং আদর্শের প্রকৃত অনুসারী। খিলাফতের শুরুর দিকে খলিফাগণ নিজের কষ্টার্জিত আয় থেকে সংসার নির্বাহের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খিলাফতের কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ভাতা গ্রহণ করতেন। তাঁদের পোশাক, আচার ব্যবহার, বিলাসিতা, সবকিছুই ছিল ইসলামের গণ্ডির ভেতরে। তিন জন খলিফা আক্ততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন তবু কোনো খলিফা দেহরক্ষী নিয়োগ করেননি।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



অধিবাসীর শ্রেণি: খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ৩ শ্রেণির অধিবাসী বসবাস করত-
১. মূল আরবীয় মুসলমান,
২. নবদীক্ষিত মুসলমান ও
৩. জিম্মি বা ইহুদি, খ্রিষ্টান, পারসিক বা অন্যান্য মুসলমান।
খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ আরবীয় মুসলমানের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। রাষ্ট্র থেকে তাদের জানমালের নিশ্চয়তা দেওয়া হতো।
জিম্মিরা মহানবি (স.)-এর আমলের ন্যায় পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। হযরত উমর (রা.) তাঁর রাজস্ব কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো জিম্মির প্রতি তার শক্তির অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণ করবে না। অপর একজন কর্মচারীকে বলেন, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "Umar had keen eye over the advantage of the non-Muslims and spared no pains to promote their welfare." (উমর অমুসলিম প্রজাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাঁদের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করতেন)।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



নারীদের মর্যাদা: সমাজে নারীরা কুরআন ও হাদিস অনুসারে পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করত। আরবদের মধ্যে মেয়েরা তখন ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রজাতান্ত্রিক মুসলিম মহিলারা স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করত। শুনতে যেত খলিফাদের ধর্মোপদেশ। পারিবারিক জীবন ছিল পিতৃতান্ত্রিক। মা-বাবা, স্বামী এবং সন্তানের সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার ছিল। মুসলিম ফারায়েজ খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে পুরাপুরি মানা হতো।

দাসদাসীর অবস্থা: খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে মুসলিম সমাজ দাসদাসীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "দাস কেনাবেচা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।" প্রবলভাবে আদম ব্যবসায়কে নিন্দা করা হতো। যেসব লোক আইনসম্মতভাবে যুদ্ধে বন্দি হতো শুধু তাদেরকেই মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত দাস হিসেবে রাখার অনুমতি দেওয়া হতো। দাসদাসীরা সেখানে পরিবারের লোকদের ন্যায় মর্যাদা পেত।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



অতিথিপরায়ণতা: আরবেরা তাদের অতিথি বাৎসল্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কোনো মেহমান বাসায় আসলে নিজের আর্থিক দৈন্য থাকা সত্ত্বেও মেহমানদারি করতে তারা কার্পণ্য করত না। মেহমান শত্রু হলেও তারা মেহমানের মর্যাদার হানি করত - না। মেহমানকে নিয়ে তারা এক সাথে খেতে বসত।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে জনসাধারণের প্রভূত নৈতিক, বৈষয়িক ও - আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এটি শুধু মুসলিম ইতিহাসে নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক অমর ও অক্ষয় অধ্যায় সংযোজন করেছে।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



জনহিতকরণ কার্যাবলি : খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে পৃথক জনহিতকর বিভাগ ছিল না। তাই খলিফাদের অনুমোদনক্রমে প্রাদেশিক শাসকগণ কার্যাবলি পরিচালনা করতেন। কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য বহু সংখ্যক খাল খনন করা হয়। মিশর ও আরবের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য হযরত উমরের অনুমতিক্রমে আমর বিন আল আস সুয়েজ খাল খনন করেন। আরবরা একে আমিরুল মোমেনিন খাল বলে অভিহিত করত। এছাড়া আবু মুস। খাল, নহর-ই-মালিক, নহর- ই-মুসা ইত্যাদি খাল খনন করে বহু অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা হয়। দজলা ও ফোরাতের উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়। মিশর, সিরিয়া ও পারস্যে জমি জরিপ করা হয়। এ সময়ে বহু রাষ্ট্রীয় ভবন, সরকারি দফতর, মালখানা, কারাগার, সেনানিবাস, অতিথিশালা, সড়ক, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, মুসলিম জাহানের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল ছিল গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের স্বল্পকালীন শাসনামলে বিশ্ব ইতিহাসের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির এক অমর ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ সময়ে আপামর জনগণের প্রভূত বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এটি শুধু- মুসলিম ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও স্মরণীয় অধ্যায় সংযোজন করে। খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ইসলামের সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হয়। তাদের শাসনে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অভাবনীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে। তাদের শাসনামলে প্রতিটি যুগের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

স্থাপত্য: সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত বেদুইনের বাসগৃহ ছিল মূলত তাঁবু। এ তাঁবুতে ন্যূনতম তৈজসপত্র ছিল। আসবাবপত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। তবে তখনকার দিনের সচ্ছল লোকদের বাসগৃহ সুসজ্জিত ছিল। এ সময়ে মহানবি (স.)-এর এক বিশিষ্ট সাহাবি যুবাইর বসরা, কুফা, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়ায় বহু ব্যয় সাপেক্ষ গৃহনির্মাণ করেছিলেন। তালহা কুফায় একটি সুরম্য বাড়ি এবং মদিনায় গৃহের উন্নতি সাধন করেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আর-আকিতে একটি সুরম্য বাড়ি নির্মাণ করেন। সংগতিসম্পন্ন লোকেরা গৃহনির্মাণে পাথর ও কাঠ ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্তরা পোড়া ইট দিয়ে ইমারত নির্মাণ করত। প্রথম খলিফার সময় থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী বিজিত অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করার পাশাপাশি মসজিদ স্থাপন করে। মসজিদে নব্বীর অনুকরণের বসরা, কুফা ও ফুসতাতে মসজিদ স্থাপিত হয়। উৎত্তা বিন গাজওয়ান ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আরবদেশের বাইরে বসরায় সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আমর বিন আল আস ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফুসতাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

# খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিশ্লেষণ



খুলাফায়ে রাশেদিনের মূলনীতিই ছিল যা আয় করা হবে, তা বৈধভাবে আয় করতে হবে। এটি রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। রাষ্ট্র সুদভিত্তিক ব্যবসায় বাণিজ্য, যাবতীয় লেনদেন বন্ধ করে দেয়। মদসহ যাবতীয় নেশাজাতীয় দ্রব্যের কেনাবেচনা ও ভোগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাষ্ট্র। পবিত্র কুরআনের ১৭ : ২৬-২৭ ও ১৭ : ২৯নং আয়াতের আলোকে যার যা প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এভাবে ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি অর্থনীতি পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রদেশ বা জেলাগুলোতে এর শাখা বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল- ১. উশর, ২. খারাজ বা ভূমি রাজস্ব, ৩. জিজিয়া, ৪. যাকাত ও সাদকা, ৫. যুদ্ধলব্ধ গনিমত, ৭. খারাইব বা জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক আরোপিত সাময়িক কর, ৮. কারলাস বা সরকারি ভূমি থেকে লব্ধ রাজস্ব, ৯. আমদানি শুল্ক, ১০. ওয়াকফ, ১১. খনি বা খনিজদ্রব্য ইত্যাদি সূত্র থেকে লব্ধ বিভিন্ন রাজস্ব।

সরকারি আয় নির্ধারণে বা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার জুলুম করা হতো না। কৃষকগণ তাদের উৎপন্ন ফসল হতে ইসলামের নির্দিষ্ট হারে উশর ও খারাজ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বা বায়তুল মালে জমা দিত।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৭ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

# কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য



- খিলাফত শব্দের উৎপত্তি খলিফা থেকে
- খিলাফত শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব
- খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থ সত্য/ন্যায়পথের অনুগামীগণ
- সিদ্দিক অর্থ বিশ্বাসী
- রিদ্দা অর্থ স্বধর্মত্যাগ
- ইয়ামামার যুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে মৃত্যুর বাগান হিসেবে
- রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল
- উমর (রা.)-এর উপাধি ছিল ফারুক
- ফুসতাত শহর প্রতিষ্ঠা করেন আমর বিন আস
- উসমান (রা.)-এর উপাধি ছিল যুনুরাইন
- হযরত আলী (রা.) উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ
- শিয়া অর্থ দল বা সম্প্রদায়-
- খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর উপাধি ছিল সাইফুল্লাহ
- জিজিয়া হলো অমুসলিমদের নিরাপত্তা কর
- জঙ্গে জামাল অর্থ উষ্ট্রের যুদ্ধ

# কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য



- খলিফা অর্থ প্রতিনিধি
- খলিফা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়
- আতিক অর্থ দানশীল
- আবু বকর (রা)-এর উপাধি ছিল আতিক ও সিদ্দিক
- মুসায়লামাকে বলা হয় কাযযাব ( মিথ্যাবাদী )
- পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদায়েন
- ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিচিত আবু বকর (রা)
- ফারুক অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী
- মজলিস-উশ-শূরা অর্থ পরামর্শ সভা
- যুনুরাইন অর্থ দুই জৌতির অধিকারী
- আসাদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর সিংহ
- খারেজি অর্থ দলত্যাগী

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৮ সালভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

# সালভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা



৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত আবু বকর কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।
৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত উমর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।
৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম তথা খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন।
৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ : খলিফা আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।
৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং ইসলাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হযরত উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত উমর (রা.) জেরুজালেম বিজয় করেন।

# সালভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা



৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ: সেনাপতি আমর আল আস মিসর বিজয় করে ফুসতাত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।
৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত উমর (রা.) আবু লুলু ফিরোজ নামক জনৈক পারসিকের হাতে শহিদ হন এবং হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ : ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ তথা উষ্ট্রের যুদ্ধ হযরত আলী (রা.) ও আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়।
৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ : খারেজিদের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত আলী (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে মুলজামের হাতে শহিদ হন এবং খিলাফতের অবসান তথা খুলাফায়ে রাশেদিনের অবসান হয়।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ০৯ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



#খিলাফত

'খিলাফত' শব্দটি এসেছে 'খলিফা' থেকে; যার অর্থ প্রতিনিধি। আর খিলাফত অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব খিলাফত ইসলামি শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত অর্থে মুসলিমদের প্রধান রাষ্ট্রনেতার পদবিরূপেও ব্যবহৃত হয়। খলিফা কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রকে খিলাফত বলা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে 'খলিফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় ইমাম, আমিরুল মুমিনিন খলিফা শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে খালদুন বলেন, "খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবি (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।"

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# খুলাফায়ে রাশেদিন

[ঢা. বো. '২১;য, বো. '২১; কু. বো. '২১; চ. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

খলিফা শব্দের বহুবচন খুলাফা, খুলাফায়ে রাশেদিনের অর্থ সত্য ও ন্যায়পথের অনুগামীগণ। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবি পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রতিনিধিত্বরূপে ৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তারা খুলাফায়ে রাশেদিন নামে পরিচিত। খুলাফায়ে রাশেদিন ছিলেন- ১. হযরত আবু বকর (রা.), ২. হযরত উমর (রা.), ৩. হযরত উসমান (রা.) এবং ৪. হযরত আলী (রা.)। তারা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের পথে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন বলেই তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# রিদ্দার যুদ্ধ

'রিদ্দা' আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো স্বধর্মত্যাগী বা পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তন। রাসুলে করিম (সা.)-এর ওফাতের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণির লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তন শুরু করে। তাছাড়া একমাত্র হেজাজ ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব দেশে নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রও ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কতিপয় ভণ্ডনবির উদ্ভব হয়। এছাড়া অনেকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এসব ভণ্ডনবি ও বিদ্রোহী গোত্রের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাকে রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়।

# সিদ্দিক

সিদ্দিক অর্থ সত্যবাদী। মহানবি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দিক বা সত্যবাদী উপাধি দিয়েছিলেন। মক্কার কাফির-মুশরিকরা মিরাজের ঘটনা শুনে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে এবং বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। এ ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি এ ঘটনাকে বিশ্বাস করি এবং সত্য হিসেবে মেনে নিলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ স্বীকৃতির কারণেই হযরত আবু বকর (রা.) কে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



## ভণ্ডনবি

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের শেষদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ড বা নকল নবির আবির্ভাব ঘটে। নবুয়তপ্রাপ্তিকে তারা লাভজনক মনে করে নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। ভণ্ডনবিদের মধ্যে ইয়েমেনের আসাদ আনসিই ছিল প্রথম। সে হযরত (স.)-এর জীবিতকালে দশম হিজরিতে নবুয়ত দাবি করে এবং ইয়েমেনের মুসলিম শাসককে বিতাড়িত করে রাজধানী সানা দখল করে। মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামাও নিজেকে নবি বলে দাবি করে। ভণ্ডনবিদের মধ্যে মুসায়লামা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। উত্তর আরবের বনি আসাদ গোত্রের তোলায়হা নামক এক ব্যক্তিও নিজেকে নবি বলে দাবি করে। ভণ্ডনধিদের মধ্যে মধ্য আরবের ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নাম্মী এক নাসারা নারীও নিজেকে নবি বলে দাবি করে।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# ইয়ামামার যুদ্ধ

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ভণ্ডনবিদের আবির্ভাব ঘটে। এসর ভণ্ডনবিদের মধ্যে মুসায়লামার সাথে মুসলমানদের এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা ইয়ামামার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ভণ্ডনবিদের মধ্যে মুসায়লামা নিজেকে মহানবি (সা.)-এর সমকক্ষ দাবি করে। সে ভণ্ডনবি সাজাহকে বিবাহ করে ইসলামের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ কারণে খলিফা আবু বকর (রা.) মুসায়লামা ও সাজাহর ৪০,০০০ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইয়ামামায় সামরিক অভিযান চালান। খালিদ ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। পরাজিত শত্রুপক্ষ একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে মুসায়লামাসহ ১০,০০০ সৈন্য নিহত হয়। এ কারণে আরব ঐতিহাসিক তাবারি একে 'মৃত্যুর বাগান' বলে উল্লেখ করেন। এ যুদ্ধের মুসলিম বাহিনীর ৬০০ জন মুজাহিদ শহিদ হন। মুসলিম বাহিনীর শহিদ ৬০০ জনের মধ্যে ৩০০ জন হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# আসাদুল্লাহ

আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর সিংহ। এটি হযরত আলী (রা.)-এর উপাধি। হযরত আলী (রা.) ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা। তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে থেকে অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। খায়বার যুদ্ধের সময় ইহুদিদের কামুস দুর্গ যখন কেউ দখল করতে পারছিলেন না, তখন রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে পাঠান। হযরত আলী (রা.) দুর্গের বিশাল লোহার দরজাটিকে এক ধাক্কায় হাতে তুলে নিলেন এবং ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে থাকলেন। ইহুদিরা এ অবস্থা দেখে ভয়ে সকলে আত্মসমর্পণ করল। এ ঘটনায় রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি প্রদান করেন।

# জামিউল কুরআন

জামিউল কুরআন হযরত উসমান (রা.)-এর উপাধি। হযরত উসমান (রা.) এর অসামান্য কৃতিত্ব হলো পবিত্র কুরআন মাজিদ সংকলন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন পাঠ ও উচ্চারণে অসংগতি দেখে তা নিরসনের জন্য হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ বিশেষজ্ঞ কমিটি খলিফা উমর (রা.)-এর কন্যা বিবি হাফসা (রা.)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বিশুদ্ধ কুরআন মাজিদ সংকলন করেন। এজন্য হযরত উসমান (রা.)-কে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# খারেজি [সি. বো. '২১; ব. বো. '২১]

খারেজি শব্দের অর্থ দলত্যাগী। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে দুমাতুল জন্দলের সালিশি রায় অমান্য করে একটি দল তার পক্ষ ত্যাগ করে যারা ইতিহাসে খারেজি নামে পরিচিত। দুমাতুল জন্দলের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষের কিছু লোক তাকে যুদ্ধ করতে পরামর্শ দেয়। হযরত আলী তাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে তারা তার দল ত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা উগ্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। তারা নাহরায়নের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মতবাদ প্রচার করে। তারা কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে পরবর্তীতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

# যুন্নুরাইন

যু' অর্থ মালিক বা অধিকারী আর 'নুরাইন' অর্থ দুই রশ্মি বা জ্যোতি। সুতরাং 'যুন্নুরাইন' অর্থ দুই জ্যোতির মালিক বা অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মেয়ে রুকাইয়া (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিয়ে দেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কেও তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুই মেয়েকে বিয়ে করায় হযরত উসমান (রা.)-কে যুন্নুরাইন বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়। ফেরেশতাগণ কর্তৃক তিনি এ উপাধি লাভ করেন।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# দিওয়ান

দিওয়ান বলতে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান-উল-খারাজকে বোঝায়। রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করা এবং জাতীয় আয়ের সুষ্ঠু বিলিবণ্টনের জন্য হযরত উমর (রা.) এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখাই ছিল এ বিভাগের অন্যতম কাজ। বিজিত এলাকার জমির বণ্টন, রাজস্ব নির্ধারণ ও তা আদায় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন সাধনে এবং প্রজা মঙ্গল সাধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগের ওপর অর্পিত ছিল। এ বিভাগ যাবতীয় আয় হতে ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উদ্ধৃত অর্থ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

# মজলিস-উশ-শূরা (সকল বোর্ড, '২১]

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় পরামর্শ সভাকে মজলিস-উশ-শূরা বলা হয়। 'শূরা আরবি' শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরামর্শ। সুতরাং মজলিস-উশ-শূরা বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভাকে বোঝায়। ইসলামপূর্ব আরবের আল-মালার অনুকরণে মহানবি (সা.) ও আবু বকর (রা.) পরামর্শ সভা চালু রাখেন। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) পরামর্শ সভার আধুনিকায়ন করে মজলিস-উশ-শূরা গঠন করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন পরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না। মজলিস উশ-শূরা দুভাগে বিভক্ত ছিল। যথা: (ক) মজলিস আল-খাস ও (খ) মজলিস আল-আম।

# অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা



# দুমার মীমাংসা

সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে মীমাংসা করার জন্য সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী দুমাতুন জন্দল নামক স্থানে যে সালিশি বসে তাকে দুমাতুল জন্দলের সালিশি বলে। এ মীমাংসায় হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে আবু মুসা আশারী ও মুয়াবিয়া-এর পক্ষে আমর ইবনে আস প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ৪০০ করে দু'পক্ষের ৮০০ লোক বৈঠকে অংশ নেয়। এ মীমাংসা প্রহসনে রূপ নিলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য নষ্ট হয়।

বায়তুল মাল

[রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; সি. বো. '২১; ব. বো. '২১]

ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থাকলেও তা বায়তুল মাল হিসেবে অভিহিত হতো না। পরবর্তীতে হযরত আবুবকর (রা.)-এর সময় আংশিক ও হযরত উমর (রা.)-এর সময় পূর্ণাঙ্গ বায়তুল মাল গঠন করা হয়। হযরত উমর (রা.) ওয়ালিদ-ইবনে হিশামের পরামর্শে আব্দুল্লাহ বিন আল কামকে বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। বায়তুল মালের সঠিক হিসাব রাখার জন্য তিনি দিওয়ান নামে পৃথক বিভাগ গঠন করে একে আয় ও ব্যয় বিভাগ নামক দুটি বিভাগে বিভক্ত করেন।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান



প্রশ্ন ১- গাজান খান পারস্যের ইলখানী শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইলখানি বংশের এক সংকটময় মুহূর্তে সিংহাসনে বসেন। স্বীয় প্রতিভা, সাহস, দক্ষতা ও সাংগঠনিক শক্তিবলে তিনি পারস্যের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যে সমস্ত বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তিনি সেগুলো কঠোর হস্তে দমন করে আসন্ন বিপদের হাত থেকে ইলখানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। এজন্য তাকে ইলখানি সাম্রাজ্যের 'রক্ষাকারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ক. গনিমত কী?

খ. 'মজলিস-উশ-শূরা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের গাজান খানের সাথে খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

[য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩]

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান



প্রশ্ন২- ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে মানুষকে শোষণ করা, মানুষের শক্তিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ধর্মীয় বিভিন্ন দল ও মতের জন্ম হয়। অনেক ব্যক্তি ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে। মানুষ তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তাদের ভক্তি করে এবং অনুসরণ করে। মানুষ নিজের আয়-উপার্জন থেকে সরকারকে কর দেওয়ার বিষয়ে সবসময়েই অনীহা প্রকাশ করে। ইতিহাসে কর না দেওয়ার দাবিতে অনেক বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক. বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. মজলিস-উশ-শূরা গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর মওকুফের দাবিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ হয়েছিল তা পর্যালোচনা কর। সে সর্বসাত ছাড়াগতো কাতার লিজার

[ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান



প্রশ্ন -৩ লাবণ্য তার পাঠ্যবই থেকে একজন সাহাবির জীবনী পাঠ করেছে। তিনি ছিলেন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি। তিনি অনেক বেশি নবি ভক্ত ছিলেন। তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে।

ক. রিদ্দার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. 'মজলিস-উস-শূরা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসলামের ইতিহাসে লাবণ্যের পঠিত সাহাবির অবস্থান নিরূপণ কর।

ঘ. 'উক্ত সাহাবিকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়'- তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

[কু. বো. '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

টপিক – ১১ বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান

# বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান



১.'খলিফা' শব্দের অর্থ কী?

ক. রাজা। খ. সুলতান

গ. আমির ঘ. প্রতিনিধি

২.'খিলাফত' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

ক. ফারসি ভাষার খ. আরবি ভাষার

গ. হিন্দি ভাষার ঘ. ইয়েমেনী ভাষার

৩.'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রতিনিধিত্ব। খ. সম্রাট

গ. আমির ঘ. সেনাপ্রধান

৪. 'খলিফা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. আমির খ. আমিরুল মুমেনিন

গ. আমিরুল ইসলাম ঘ. সম্রাট

৫. খিলাফত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? | সকল বোর্ড '২১]

ক. Representative. খ. Represent

গ. Leadership ঘ. Ruler

# বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান



৬.খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল কত বছর ছিল?। [সকল বোর্ড '১৬]

ক. ৪০ বছর　　খ. ৩০ বছর

গ. ৩৫ বছর　　ঘ. ৫০ বছর

৭.নিচের কোনটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান? [সকল বোর্ড '২১]

ক. খিলাফত　　খ. মসজিদ

গ. নির্বাচন কমিশন　　ঘ. দরবার

৮.খিলাফত কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? [সকল বোর্ড '১৮]

ক. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক　　খ. রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক　　ঘ. ধর্মীয় ও নৈতিক

৯.হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) কীভাবে। খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন?

ক. অভিজাতদের সমর্থনে　　খ. প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সমর্থনে

গ. বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে　　ঘ. নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক

# বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান



১০. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কোনটি? [সকল বোর্ড '২১]

ক. ৬৩০–৬৬০ খ্রিস্টাব্দ খ. ৬৩২——৬৬১ খ্রিস্টাব্দ

গ. ৬৩২-৬৬০ খ্রিস্টাব্দ ঘ. ৬৩২-৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ

১১. ইসলামি জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হয়—

ক. ইসলামের প্রাথমিক যুগে খ. খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে

গ. উমাইয়া আমলে ঘ. ব্রিটিশ আমলে

১২. খুলাফায়ে রাশেদিন কত জন?

ক. দু জন খ. চার জন

গ. ছয় জন ঘ. সাত জন

১৩. খুলাফায় রাশেদিনের খিলাফতকাল ছিল-

ক. ৩০ বছর খ. ৩৫ বছর

গ. ৩২ বছর ঘ. ৩৪ বছর

১৪. খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদবি ছিল—

ক. রাজা খ. আমির

গ. খলিফা ঘ. প্রজা

# বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান



১৫. খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা কে?

ক. হযরত উমর (রা.)　　খ. হযরত আবু বকর (রা.)

গ. হযরত আলী (রা.)　　ঘ. হযরত উসমান (রা.)

১৬. প্রথম খলিফা নির্বাচনে কতটি দল তৈরি হয়?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

# THANK YOU